প্রথম পর্ব

।। এক।।

শাঁখের শব্দে গোপালাচারীর ঘুম ভেঙে গেল। হাত মুখ ধুয়ে তিনি বারান্দায় এসে বসলেন। এখনো ভোরের আলো ফোটেনি। পাশের একটা বাড়ী থেকে মহালয়ার শারদ বন্দনা শোনা যাচ্ছে। পুজোর আর সাত দিন বাকি। হালকা একটা ঠান্ডা ভাব বাতাসে। গোপালাচারী একটা পুরো হাতা জামা পরে নিয়েছেন। পুজো শেষ হতে না হতেই এখানে হিমেল হাওয়ার আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। যদিও এবারে পুজো তাড়াতাড়ি হওয়াতে শীতটা ঢোকেনি বাংলায়।

গোপালাচারীর বাড়ীর কম্পাউন্ডে একটা বিশাল আমলকী গাছ আছে। দোতলার বারান্দায় শাল গায়ে বসে গাছটাকে একমনে দেখছিলেন গোপালাচারী। এই গাছটার বয়স তার সমান। পঞ্চাশ হতে চলল দুজনেরই। পুজো শেষ হয়ে গেলেই গাছটা পাতা ঝরাবার তোড়জোড় শুরু করবে। খড়গপুরের শীতটা সত্যি বেশ বেশি। আর কিছুদিন গেলেই একেবারে হাড়ে হাড়ে কাঁপন ধরাবে। এইখানেই তার জন্ম কর্ম সবকিছু। শুধু বি টেকের পরে দীর্ঘ পনের বছর তিনি বিদেশে ছিলেন। তারপর আবার ফিরে চলে আসেন খড়গপুরে। এখানের আই আই টি-তে প্রফেসরি পেতে তাঁর কোন অসুবিধাই হয় নি। তিনি পৃথিবীর সেরা ইনস্টিটিউটের ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন এককালে। এখন তাঁর নাম পৃথিবীর প্রথম শ্রেনীর বিজ্ঞানীদের সাথে একসাথে উচ্চারিত হয়।

সদু এক পট গরম কফি আর একটা পোস্টকার্ড সাইজের খাম দিয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে কেউ একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। খামটা দেখে গোপালাচারী বেশ অবাক হলেন। আজকাল কেউ চিঠি লেখে নাকি আবার? তার তো ইমেল ছাড়া আর কিছু আসেই না। এখানকার ছাত্ররাও দুটো ঘর পরে গিয়ে কথা বলার থেকে ইমেল করে বেশি। তাও কুরিয়ার আসে অনেক গোপালাচারীর বাড়িতে। বেশির ভাগই বিদেশী বিজ্ঞান পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলোর অনেকগুলিতেই তার বিভিন্ন পেপার বেরিয়েছে। গত দশ বছর ধরে তিনি যে বিষয়টা নিয়ে চর্চা করছেন তা হল ভূমিকম্প। বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম ঘটনার প্রভাবে ভূমিকম্প। এর উপরে তার অনেকগুলো পেপার বিদেশে বেশ স্বীকৃতি পেয়েছে। সর্বোপরি একটা যন্ত্র। গোপালাচারী মনে করেন ভূমিকম্পকে সঠিকভাবে ডিটেক্ট করার যন্ত্র তিনি বানাতে পারবেন। কিন্তু এখনো তিনি সেইভাবে সফল হতে পারেননি।

তবে বেশ কিছু প্রাথমিক যন্ত্র তিনি বানিয়েছেন। এমনকি হিমালয়ের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে সেগুলো প্ল্যান্টও করেছেন। এই তো কিছুদিন বাদেই তিনি এক পর্বতারোহী দলের সাথে উত্তর গাড়োয়াল অঞ্চলে হেমকুণ্ডর থেকে আরো উত্তরে একটা জায়গায় যাবেন। হাতি পর্বত বলে কি একটা পাহাড় আছে ঐ অঞ্চলে সেখানে এই পর্বতারোহীরা একটা এক্সপিডিশন করবে। গত বেশ কিছু বছর ধরেই গোপালাচারী কলকাতার এই পর্বতারোহী দলটার সঙ্গে এদিক ওদিক যাচ্ছেন। যদিও তিনি কোনবারেই বেস ক্যাম্পের উপরে ওঠেননি। বেস ক্যাম্প অবধি যেতেই অবশ্য তার অবস্থা কাহিল হয়ে যায় প্রতিবারেই। গত কয়েকবার গিয়ে গিয়ে তাঁর সাহস বেড়েছে। এইবারে এক্সপিডিশনটা বেশ কঠিন। অনেক লম্বা পথ ট্রেকিং করতে হবে তাঁদের। ঐ পর্বতারোহী দলের দলপতি তাকে বেশ কিছু ব্যায়াম দেখিয়ে দিয়েছিল প্রথমবারেই। গোপালাচারী সেগুলো প্রতিদিন সময় ধরে দুবার করে চর্চা করেন। তবুও বয়সের একটা ব্যাপার তো আছেই।

মহালয়ার শেষ অংশটুকু উচ্চারিত হচ্ছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সানুনাসিক কণ্ঠস্বরে। পট থেকে আরেক কাপ কফি ঢেলে গোপালাচারী খামটা তুলে নিলেন। চিঠিটা এসেছে তিব্বত থেকে। গোপালাচারী বেশ অবাক হলেন। তিব্বতে তো কাউকে তিনি চেনেন না। অনেক সময় বিভিন্ন বিদেশী ইউনিভার্সিটি থেকে লেকচারের জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রন আসে। কিন্তু তিব্বতে খুব বড়সড় ইউনিভার্সিটি আছে বলেও তিনি শোনেননি।

দ্বিধাজড়িত আঙ্গুলে তিনি খামটা খুললেন। ভেতর থেকে এক গাছি লাল হলুদ সুতোর গুচ্ছ তার কোলের উপর পড়ল। আশীর্বাদক সুতো। বহুদিন আগে তিনি যখন বিদেশে থাকতেন তখন তাঁর মা দেশ থেকে ছেলের মঙ্গলকামনায় এই সুতো পাঠাতেন। আজকের দিনে এই সুতো কে পাঠাল তাঁকে? মা মারা যাওয়ার পর থেকে নিজের কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তো তিনি যোগাযোগ রাখেন না। তাহলে! গোপালাচারী সুতোর গাছিটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

লাল এবং হলুদ সুতো। অদ্ভুত ভাবে গিঁট দেওয়া পরস্পরের সঙ্গে। তাঁর মাথায় বিদ্যুতচমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল। এটা কি কেইন স্যেৎস্নের পাঠানো?

কেইন স্যেৎস্ন একজন ইহুদী বিজ্ঞানী। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই তার ইলেকট্রনিক্স বিদ্যা সারা পৃথিবীতে হইচই ফেলে দিয়েছিল। গোপালাচারীর আজকের চিন্তাভাবনার পিছনে কেইনের অনেকটাই হাত আছে। প্রথম যুগে গোপালাচারী শুধু ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডেই কাজ করতেন। ম্যাসাচুসেটসে তিনি প্রথম কেইনের আন্ডারে মাস্টারস করার সুযোগ পান। মাস্টারস, পি এইচ ডি আর পোস্ট ডক মিলিয়ে প্রায় ছয় সাত বছর তিনি কেইনের সান্নিধ্যে ছিলেন। কেইনের মত মাস্টার মাইন্ড তিনি খুব কমই দেখেছেন। শেষের দিকে কেইনের সাথে তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। কেইন এই আন্তর্জাল দুনিয়াটাকে একদম বিশ্বাস করত

না। সে সব সময়ই বলতো যে কোন মেইল বা নেট কানেক্টেড কম্পিউটার হ্যাক করে দু মিনিটের কাজ মাত্র। তা সে যতই সিকিয়োর হোক না কেন। তা সে করতেও পারত। গোপালাচারী দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

কিন্তু কেইনের মূল কাজ ছিল দূরূহ ইলেক্ট্রনিক সার্কিট বোর্ডের উপর। কত সুক্ষাতিসুক্ষ যন্ত্রপাতি যে সে বানিয়ে ফেলত চটজলদি তা গোপালাচারীর কল্পনারও বাইরে ছিল সেই সময়। গোপালাচারীর পোস্ট ডক করার সময়ই কেইন ফিরে গেছিল নিজের দেশে। জার্মানে। নিয়মিত চিঠি চালাচালি করত তারা। যেহেতু কেইন মেইল সিস্টেমকে বিশ্বাস করত না একদমই তাই সে এক নিজস্ব পদ্ধতি বানিয়েছিল চিঠির। সে পদ্ধতি জানা থাকলে অতীব সহজ আর না জানা থাকলে অত্যন্ত কঠিন। পুরনো কথা ভাবতে গিয়ে গোপালাচারীর মুখে সুক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। কেইন তার শেষ চিঠিতে গোপালাচারীকে জানিয়েছিল যে সে জার্মানে এক গুপ্ত আর্কাইভ খুঁজে পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের। আর সেখানকার কিছু তথ্য দেখলে গোপালাচারীর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সে সেই তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করতে যাচ্ছে। ফিরে এলে অবশ্যই গোপালাচারীকে সে নিজের কাজে যুক্ত করবে। কারন গোপালাচারীই তার সব থেকে কাছের বন্ধু।

গোপালাচারীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। সেই চিঠির পরে আজ কুড়ি বছরের উপর কেটে গেছে। আর কোন খোঁজ তিনি পাননি একদা পৃথিবীবিখ্যাত জিনিয়াস কেইন স্জেৎস্নের। সেই মানুষের চিঠি কিনা তিব্বত থেকে? গোপালাচারী সুতোগাছিটা নিয়ে ঘরে গেলেন। এটার পাঠোদ্ধার করতে হবে।

ঘন্টা খানেকের ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে তিনি পুরো চিঠিটা খাতায় লিখলেন শেষমেশ।

প্রিয় গোপাল,

বহুদিন তোমার খোঁজ নেওয়া হয় না। শুনেছি তুমি নাকি এখন ইলেকট্রনিক দুনিয়ায় প্রথম সারির মানুষ। তোমার মধ্যে প্রতিভার স্ফুরন আমি তখনই দেখেছিলাম। সেই প্রতিভা যে অন্য কোন কারনে নষ্ট হয়ে যায়নি তা দেখে অতীব খুশি হয়েছি। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে কাজের কথা বলি।

তোমার মনে আছে আমি বলেছিলাম যখন আমি ফিরে আসব তখন তোমার সাহায্য আমার দরকার পড়বে। না! আমি এখনো ফিরে আসিনি বিজ্ঞানের দুনিয়ায়, কিন্তু তোমার সাহায্য আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমি তিব্বতের এক প্রায় নির্জন স্থানে আজ বহুবছর একটা যন্ত্র নিয়ে জটিল গবেষণা করছি। আমার যন্ত্রটি বিগত পাঁচ বছর ধরে ভালই চলছিল কিন্তু হঠাৎ এই বছরের শুরুতে কোন কারনে যন্ত্রটি আর আগের মত কাজ করছে না। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে যন্ত্রের কিছু অংশের সার্কিট নষ্ট হয়ে গেছে। আমার খুব জানা প্রয়োজন যে সার্কিটগুলি কিভাবে নষ্ট হল। এখানে কোন মনুষ্যকৃত ক্ষতির সম্ভবনা নেই। সেক্ষেত্রে বাকি থাকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ। যন্ত্রের খারাপের সময় এখানে কোন রকম প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটেনি। এক্ষেত্রে আর একটাই মাত্র কারন হতে পারে তা হল মহাজাগতিক।

তোমার সাথে এখন নাসার নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে। তুমি ওদের কাছ থেকে যদি জানতে পারো যে এই বছর শুরুর দিকে কোন মহাজাগতিক বিপর্যয় আছড়ে পড়েছে কিনা তিব্বতে, তাহলে আমি অত্যন্ত বাধিত থাকব।

আমার এই চিঠি তুমি কোথাও লিখে রাখবে না। আর আমার নামও তুমি কোন বিজ্ঞানীর কাছে উত্থাপন করবে না। তুমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে আমাকে নিম্নবর্তী ঠিকানায় চিঠি পাঠাবে সুতোলিপির সাহায্যে।

ইতি,

কেইন স্জেৎস্ন।

ইংরাজীতে লেখা চিঠিটা পড়ে গোপালাচারী একটুক্ষন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর একটা দেশলাই জ্বালিয়ে লেখা চিঠির পাতাটা পুড়িয়ে ছাই করতে করতে আরো কিছুক্ষণ ভাবলেন পুরো ব্যাপারটা। কি এমন যন্ত্র বানাচ্ছে কেইন যে তিব্বতের নির্জন স্থান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার জন্য? আর তিব্বতের মত জায়াগায় তাকে সেই জটিল যন্ত্রের জিনিসপত্রই বা সাপ্লাই দিচ্ছে কে? একটা সার্কিট বহু কারনে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত কোন কারনের কথা না ভেবে কেইন হঠাৎ করে মহাজাগতিক কারনের কথা ভাবতে গেল কেন?

এই বছর শুরুতে কোন বিশেষ মহাজাগতিক ঘটনা ঘটেছে বলে তো গোপালাচারী শোনেননি অন্ততঃ। দেবীপক্ষের শুরুতে গোপালাচারী এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

।। দুই।।

গত কয়েক বছর ধরেই হিমালয়ান রেঞ্জে এত ভুমিকম্প, ধ্বস আর বন্যা হচ্ছে যে মিলিটারিরা প্রায় পুরো পাহাড়াটাকেই বন্ধ করে দিয়েছে। এতে করে সব থেকে বেশি অসুবিধা হচ্ছে রুদ্রদের মত পর্বতারোহীদের। দিন দুয়েক হল রুদ্ররা শেষ গ্রামটা পিছনে ফেলে এসেছে। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস পার করে তাদের যাত্রা এখন হাতিঘোড়া পাহাড়ের দিকে। গত কয়েকবছরে অলকানন্দার মারাত্মক বন্যা আর পরের পর ভূমিকম্প ফুলের বাগিচাকে তছনছ করে ছেড়েছে একেবারে। এর আগেও হাতি পাহাড়ে এসেছে রুদ্রশংকর। কিন্তু তখন সে ছিল সাধারন পর্বতারোহী। এবারে সেই দলের ক্যাপ্টেন। আর আগের বারের সাথে এইবারের কোন তুলনাই চলে না। আগের বার মিলিটারি আর বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে পাল্লা দিয়ে এদিকের রাস্তাও অনেক ভালো হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণুপ্রয়াগ অবধি আসতে কোন অসুবিধাই হয়নি বলতে গেলে। তারপরে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের রাস্তাও অনেক মসৃন ছিল। কিন্তু এবারে বিষ্ণুপ্রয়াগের আশে পাশের রাস্তা আর গ্রামগুলোই তছনছ করে দিয়েছে অলকানন্দা আর ধৌলিগঙ্গা মিলে। অবশ্য মিলিটারি অনেকটা গড়ে তুলেছে আবার। নয়তো পুরো পরিকল্পনা বাতিল করে ফিরেই যেতে হত রুদ্রদের। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের মাইল পাঁচেক আগে একটা গ্রাম আবার গড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। সেখান থেকেই রুদ্ররা তাদের র‍্যাশন আর মালবাহকদের সংগ্রহ করেছে।

গত কয়েকবছর ধরেই রুদ্রদের সাথে একজন বিজ্ঞানী আর তার সহকারী হিমালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পগুলোতে যাচ্ছেন। অমলদাই এনাদেরকে প্রথম দলে ঢুকিয়েছিল। কিন্তু গতবছর এক্সপিডিশনে ফ্রস্ট বাইটে অমলদার পা'টা বাদ দিতে হল। অমলদা আর পাহাড়ে আসেনা। বিজ্ঞানীরা তাঁদের সাথে ঠিক যোগাযোগ রেখেছেন। এবারেও কীসব যন্ত্রপাতি নিয়ে দুজন এসেছেন।

"কি করছো?", ভাঙ্গা বাংলার ডাক শুনে রুদ্র পিছনের দিকে তাকাল। বিজ্ঞানী বংশীরত্নম গোপালাচারী। ভদ্রলোক বংশগত ভাবে দক্ষিন ভারতীয় কিন্তু জন্ম বাংলায়। ভদ্রলোক দু মগ কফি নিয়ে এসেছেন। রুদ্র একটা মগ নিল। গোপালাচারী এই তরুন পর্বতারোহীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কয়েক বছর আগেই অমলের নেতৃত্বে তারা যখন অন্নপুর্না এক্সপিডিশনে গেছিল তখন রুদ্রর বুদ্ধি আর প্রত্যুতপন্নমতিত্বের জন্যই তিন তিন জন পর্বতারোহী আর শেরপা প্রাণে বেঁচে গেছিল।

আকাশ পরিষ্কার। টেমপারেচার হু হু করে নামছে। রুদ্র আকাশের দিকে তাকাল। এরকম আকাশ সামনের কয়েকদিন থাকলে তাদের হাতি পর্বতের শৃঙ্গ জয় করতে তাদের খুব বেশি সমস্যা পোহাতে হবে না। কিন্তু তাদের কপাল কি এত ভালো হবে? বিষ্ণু প্রয়াগে একটা পুজো দিয়েছে রুদ্র। দলের সবাইকে যেন সে

ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই প্রথম সে দলপতি হয়েছে। হে ভগবান দলের যেন কোন ক্ষতি না হয়!

রুদ্র গোপালাচারীর দিকে তাকিয়ে হাসল। "আকাশের অবস্থা খুব ভালো। আজকে গুড্ডু আর হিমানী এক নম্বর ক্যাম্পের স্পট দেখতে গেছে। ওরা ফিরে এলেই আমরা জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেব। যত তাড়াতাড়ি ক্লাইম্ব শুরু করা যায় ততই ভালো। হিমালয়ের আবহাওয়ার কথা কিছুই বলা যায় না। কি বলেন? আপনি বিজ্ঞানী মানুষ।"

গোপালাচারী মাথা নাড়লেন। "আবহাওয়ার কথা কখনোই ঠিক করে বলা যায় না রুদ্র। এই দেখোনা ভূমিকম্প, সুনামি বা সাইক্লোন জাতীয় ঝড়। এগুলোর একটাও কি তুমি আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারবে?"

রুদ্র ঘাড় নাড়ল, "তা ঠিক। আপনার কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে? কি রকম কি বুঝছেন?"

গোপালাচারীর কফিতে চুমুক দিল, "ঠিক কিছুই বুঝছি না। ভৌগলিক অবস্থা বড়ই জটিল লাগছে। এরকম ঠিক হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হয়েছে। কেন হয়েছে সেটা ঠিক বুঝতে পারছিনা।"

রুদ্র একটু চিন্তিত হল, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি হয়েছে?"

গোপালাচারী একটা পাথরের উপর আয়েস করে বসলেন। রুদ্র ও আরেকটা পাথর বেছে বসল। দুজনেই কফিতে চুমুক দিলেন।

"তুমি তো টেকটনিক প্লেটের কথা জানো?"

"হ্যাঁ জানি।"

"ইন্ডিয়ান প্লেটটা এসে ইউরেশিয়ান প্লেটকে ছুঁয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি বছর আগে। তারপর থেকে ইন্ডিয়ান প্লেটটা ক্রমশঃ ইউরেশিয়ানের পেটের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে দুহাজার কিলোমিটারের মত ঢুকে পড়েছে। এই দুই প্লেটের ধাক্কাধাক্কির ফলেই এই হিমালয়ান রেঞ্জের ভূপ্রকৃতি কিঞ্চিৎ অস্থির। সেটাই হওয়া উচিত। পৃথিবীর যেখানেই এরকম প্লেটের প্রান্তদেশ মিলিত হয়েছে সেখানেই ভূমিকম্পটা স্বাভাবিক ঘটনা।"

"হ্যাঁ তা তো হতেই পারে। কিন্তু আমি এর আগে হিমালয়ে এত ভূমিকম্পের কথা শুনিনি প্রোফেসর। এ বছর শুরুর থেকে হিমালয় যেন ক্ষেপে উঠেছে।"

"সেটাই। হিমালয়ের ভূপ্রকৃতি অনুসারে ভূমিকম্প হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কারনে তা হত না। আর এইবছরেই সেই স্বাভাবিক ঘটনাটা হঠাৎ করে শুরু হয়েছে।"

"সে আবার কি কথা প্রোফেসর?"

"তুমি কি জানো এ বছর ভূমিকম্পের সংখ্যা কত?"

"না তা ঠিক জানি না"

"শুধু হিমালয়েই এ বছর চারটি বড় ভুমিকম্প হয়েছে। আর নেপালের ঐ বিধ্বংসী ভুমিকম্পের পরবর্তী কম্পন ধরলে মোট ছয়টা। সবকটি ভূমিকম্পই সাত রিখটারের কাছাকাছি।"

রুদ্রর হাত থেকে ঠান্ডা কফি চলকে পড়ে গেল খানিকটা। "বলেন কি? একি আবার প্লেটগুলো লড়াই শুরু করল নাকি?"

গোপালাচারী গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। "সেটা কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে হিমালয়ের ভূপ্রকৃতি অনুসারে এই ভূমিকম্পের সংখ্যাটা স্বাভাবিক।"

রুদ্র কফির মগটা মাটিতে নামিয়ে রাখল, "কিন্তু এতটা তো আগে শুনিনি। আমরা তো আজ অনেক বছর ধরেই হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"কোন এক অদ্ভুত ভূপ্রকৃতির সমন্বয় হয়ত হিমালয়কে বাঁচিয়ে রাখত।"

"তাহলে এ বছর এরকম অবস্থা কেন?"

"তুমি কি জানো এই বছর একটা অত্যন্ত বড় সৌরঝঞ্জা পৃথিবীকে আঘাত করেছে!"

"সৌরঝঞ্জা! মানে সোলার ফ্লেয়ার? কই না তো? এ ব্যাপারে তো কোন খবর পড়িনি কাগজে। টিভিতেও তো কিছু... কবে ঘটেছে?"

"টিভি বা কাগজে পাবেন না কারন নাসা এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি এখনো।"

"সে কি? কেন?"

"কারন এবারের সৌরঝঞ্জাটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। নাসার বিজ্ঞানীরা এই ঝঞ্জাটাকে আগে থেকে ক্যালকুলেশন করে উঠতে পারেনি। তার উপর বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে সাধারন সৌর ঝঞ্জার থেকে এটা একটু আলাদা। তুমি হয়ত জানোনা যে সৌরঝঞ্জার কবলে পৃথিবী প্রতি এগারো বছর অন্তর একবার করে পড়েই থাকে। এছাড়াও মাঝেসাঝে সৌরঝঞ্জা আঘাত করে পৃথিবীকে। তাই সৌরঝঞ্জা বিজ্ঞানীদের কাছে একটা প্রায় সাধারন ঘটনা। কিন্তু এবারের সৌরঝঞ্জাটি ঠিক সাধারন নয়। এটা হয়তো ভূপ্রকৃতির উপরে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তারা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত জনসমক্ষে এই নিয়ে মুখ খুলবে না।"

"সৌরঝঞ্জা কি একসাথে পুরো পৃথিবীর উপরে প্রভাব ফেলে?"

"না তা নয়। কিছু অংশের উপর। দুই হাজার তিন সালের সৌরঝঞ্জায় গোটা সুইডেন দেশটায় লোডশেডিং হয়ে গিয়েছিল।"

"এবারে সেরকম কিছু ঘটেনি?" কৌতুহলে রুদ্র ঝুঁকে বসল।

"না। কারন এবারের সৌরঝঞ্জাটা আঘাত করেছে তিব্বত অঞ্চলে। দেশটা যেহেতু জনবহুল নয়। আর সেরকম উন্নতও নয় তাই তারা হয়তো ইলেকট্রনিক্স পাওয়ার ফেলিওরটা ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি।"

"তিব্বত অঞ্চলে? কিন্তু আপনি এই খবরটা পেলেন কি করে?"

"আমি গোপনসুত্রে খবরটা পেয়েছি। আসলে আমি বেশ কিছু যন্ত্র কয়েক বছর আগে তিব্বতে প্ল্যান্ট করেছিলাম। সেগুলো সব নষ্ট হয়ে যাওয়াতে আমি অবাক হয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করি। তখনই জানতে পারি এই সৌরঝঞ্জার কথা।" – একটু কিন্তু কিন্তু করে প্রোফেসর কথাগুলো বলেই ফেলল রুদ্রকে। শুধু সত্যের সামান্য তারতম্য ঘটিয়ে।

"তাহলে আপনি বলছেন যে এই সৌরঝঞ্জা হিমালয়কে অস্থির করে তুলেছে?"

"আমি এখনই সেরকম কিছু নিশ্চিত ভাবে বলছি না। তবে বলতে পারো এটা আমার একটা সন্দেহমাত্র। নাসার বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। তাঁদের একটা দল তিব্বতেও হয়ত যাবে।"

"ওরে বাবা। এরকম ছোটখাটো ভূমিকম্প থেকেই কি আস্তে আস্তে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে নাকি?" -রুদ্রর কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। রুদ্র একটা বিদ্যুৎ চমকের মত আভা দেখতে পেল। শুধু আভা নয় তার সাথে এক বিকট কান ফাটানো শব্দ। রুদ্র হাড়কাঁপানো আতঙ্কের সাথে দেখল দূরে হাতি পর্বতের পিছনের দিকে শৃঙ্গটা আস্তে আস্তে যেন পর্বত থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একই সাথে শুরু হল পায়ের তলার দুলুনি। দেখতে দেখতে রুদ্রর চোখের সামনে পাহাড়ের চূড়াটা খসে খসে পড়তে লাগল পাহাড়ের গা বেয়ে। গোপালাচারী ততক্ষনে লাফ মেরে উঠে গলা ফাটিয়ে বাকিদেরকে ডাকতে শুরু করে দিয়েছেন।

ভূমিকম্পের আভাস পেয়ে সবাই ততক্ষনে বেরিয়ে এসেছে তাঁবু থেকে। উপর থেকে বড় বড় পাথরের বোল্ডার গড়িয়ে আসছে। একটা মানুষ সমান বোল্ডার এসে রুদ্রদের কিচেন তাঁবুটাকে মাটির সাথে পিষে দিয়ে চলে গেল। অন্যেরা সম্বিত ফিরে পেয়ে ছুটে গিয়ে অন্যান্য তাঁবু থেকে জিনিসপত্র টেনে বার করতে লাগল।

হাতি পাহাড়ের পিছন দিকটায় বড়সড় আভালাঁশে হচ্ছে। তবে সে বরফের বন্যা এইদিকে আসবে না বলেই রুদ্রের ধারনা। কারন হাতিপাহাড়ের রুদ্ররা যেদিকে আছে তার উল্টো দিকের ঢাল অনেক বেশি। তবু এখন যত দ্রুত সম্ভব ওদের নেমে চলে যেতে হবে।

পাক্কা এক মিনিট পরে দুলুনিটা শান্ত হল। তবে বোল্ডার গড়ানো তখনো কমেনি। আকাশ কালো মেঘ আর বরফের গুঁড়োয় ছেয়ে গেছে। গুড্ডু আর হিমানীর কোন দেখা নেই। এই দূর্যোগে ওদের খোঁজে কাউকে পাঠানোটাও মৃত্যুর সামিল। চিন্তায় রুদ্রর মুখ আকাশের মতই কালো হয়ে গেল। গোপালাচারী হাতের যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, "এটা মাত্র ফাইভ পয়েন্টের ছোট ভূমিকম্প। আরো কত বড় বিপদ অপেক্ষা করছে কে জানে।

।। তিন।।

পাহাড়ের পাকদন্ডী বেয়ে দ্রুত গতিতে সাবধানে নেমে আসছিল পেমা দোরজে। তার সাথে একটা মাত্র ঘোড়া। দ্রিরাপুক গুম্ফা থেকে খালি হাতেই বেড়িয়েছে পেমা। পথে চিউ থেকে কিছু খাবার আর কাপড় চোপড় জোগাড় করেছে। একটা ছোট তাঁবুও পেয়ে গেছে এই ফাঁকে। একদিন আগেই মানস সরোবর এলাকায় একটা ভূমিকম্প হয়েছে। গুম্ফা আর গেস্টহাউসগুলোতে ফাটল ধরেছে বড় সড়। কিছুদিন বাদে বেশ কিছু বিদেশী বিজ্ঞানীর আসার কথা এই অঞ্চলে। এই অক্টোবর মাসের শুরুর দিকটা মানস সরোবর ভ্রমনের পিক সিজন। অনেক যাত্রী আটকে পড়েছে সেখানে। তাই অবস্থা আরো খারাপ। এর মধ্যে এরকম প্রাকৃতিক দূর্যোগে চিনা সেনাবাহিনী সামান্য দিশেহারা হয়ে গেছে। আপাতত তারা মানস সরোবর এলাকার গুম্ফা আর রাস্তা নিয়ে ব্যস্ত। কৈলাস পরিক্রমনের পথে কোন এক জায়াগায় বড়সড় ধ্বস নেমেছে। প্রায় পঞ্চাশ জনের একটা গ্রুপ সেখানে বরফের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে। লাসা থেকে মানস সরোবর যাওয়ার পথে এক জায়গায় পাহাড় ধ্বসে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্য ত্রানের কাজ আরও জটিল হয়ে গেছে।

তবে এসব কথা ভাবার সময় এখন পেমার নেই, আগে তাকে মাস্টারের কাজ শেষ করতে হবে। মাস্টার তাকে বলেছে লিপুলেখ পাস বছরের এই সময় খোলা থাকে। যেভাবেই হোক তাকে ভারতে ঢুকে যেতে হবে এই বিপর্যয়ের মধ্যেই। পেমা বলেছিল নেপাল ঘুরে যাওয়ার কথা। নেপালে অনেক গুম্ফা আছে, মঙ্করা আছে। মাস্টার বারন করে দিয়েছে। বলেছে তিন তিনবার বর্ডার ক্রশ করতে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভবনা অনেক বেশি। তার থেকে সুবিধাজনক হচ্ছে লিপুলেখ পাস ব্যবহার করা।

পেমার কাছে মাস্টারের দেওয়া প্রায় দুশোটা কাগজের একটা মোটা বান্ডিল আছে। সেটাতে অনেক অদ্ভুত ধরনের ছবি আর লেখা। এই ধরনের ছবি কোন গুম্ফাতে কখনো পেমা দেখেনি। এই সব ছবি আঁকে বলেই হয়তো মাস্টারকে অন্য লামারা পছন্দ করে না। কিন্তু পেমা তাকে খুব ভালোবাসে। মাস্টার তাকে কত দেশ বিদেশের গল্প শোনায়। ইংরাজী ভাষাও শিখিয়েছে মাস্টার পেমাকে। পেমা তো গত দু'বছর ধরে মানস সরোবরে আসা যাত্রীদের সাথে কি সুন্দর কথাও বলতে পারে। পেমাকে কত বিশ্বাস করে মাস্টার। তাই তো এত দামী জিনিসগুলো পেমার হাত দিয়ে পাঠাচ্ছে। মাস্টার বলে দিয়েছে ভারতের মহাযোগী ছাড়া আর কারোর হাতে যেন এই কাগজগুলো না পড়ে। এমনকি পথের মাঝখানে যদি মনে হয় পেমা মারা যেতে পারে তাহলে যেন মৃত্যুর আগে সে অবশ্যই কাগজগুলো নষ্ট করে ফেলে। পেমা প্রান দিয়ে হলেও কথা রাখবে মাস্টারের। বিশাল পার্বত্য গিরিখাতের সংকীর্ন পরিসর বেয়ে পেমা এগোতে থাকল ভারতের দিকে।

"রুদ্র, তুমি কি একবার আমার বাড়ীতে আসতে পারবে?"

ভোরবেলা গোপালাচারীর ফোন পেয়ে রুদ্র যার-পর-নাই অবাক হলো। কোনমতে হাই চেপে জড়ানো গলায় বলল, "এখন?"

"হ্যাঁ এক দেড় ঘন্টার মধ্যে চলে আসতে পারলে ভালো হয়।"

"এক দেড় ঘন্টা? আপনি তো খড়গপুরে থাকেন। আর আমি কলকাতা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে... এত তাড়াতাড়ি কি করে?"

"না না। আমি কলকাতার ফ্ল্যাটে এসেছি। তুমি কি আসতে পারবে? কথা আছে তোমার সাথে। দুপুরবেলা আমার ফ্লাইট। আমি তোমার সাথে এখনই দেখা করতে চাইছি।"

"আপনার কলকাতার ঠিকানাটা ঠিক জানি না আমি।"

ঠিকানা আর ফ্ল্যাটের ডাইরেকশনটা বলে গোপালাচারী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আসছো তো?"

"হ্যাঁ আসছি।" -গোপালাচারীর ফোন রেখে বিছানার পাশ থেকে ঘড়িটা তুলল রুদ্র। ছটা বাজে! অন্যান্য দিন রুদ্র এইসময় দৌড়তে যায়। গতকাল রাতে একটা বন্ধুর বাড়ীতে অনেকরাত পর্যন্ত হৈ হল্লা হয়েছে। যথারীতি সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হয়ে গেছে। রুদ্র হাত মুখ ধুয়ে বেড়োবার জন্য জামাকাপড় পড়তে শুরু করল। রান্নাঘর থেকে ঠুং ঠাং আওয়াজ আসছে। কিন্তু এখন ব্রেকফাস্ট খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। মাকে জানিয়ে দিল আজকে বাড়ীতে খাবে না আর। অনেকদিন বাদে সে কলকাতার দিকে যাচ্ছে। সকালটা গোপালাচারীকে দিয়ে বেলার দিকে বন্ধুবান্ধবদের সাথে সময় কাটাবে। পা'টাও একবার দেখিয়ে নেবে ডাক্তারকে।

গ্রামে এমনিতেই শহরের থেকে বেশী ঠাণ্ডা পরে। জানুয়ারীর প্রথমের হাঁড়কাপানো ঠাণ্ডা। এই শীতের সকালে কাকপক্ষীরও সাড়া নেই। সূর্যটাও কুয়াশার চাদরে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছে। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টা রুদ্রর খুবই ভালো লাগে। পাঁচঘরার পাশের গ্রামের একটা স্কুলের টিচার রুদ্র। পড়াশুনাতে সে ভালোই ছিল তাই এত কাছাকাছি স্কুলেই চান্স পেয়ে গেছে। তবে তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হল মাউন্টেনিয়ারিং। মাধ্যমিকে পড়ার সময় একটা দলের সাথে সে বর্ধমানে অযোধ্যা পাহাড়ে একটা ক্যাম্পে গেছিল। সেখান থেকেই নেশাটার শুরু। তারপরে আস্তে আস্তে পাহাড় যেন তার রক্তে মিশে গেছে। এখন তো রুদ্র মাউন্টেনিয়ারিং দুনিয়ায় ভারতের একজন নামকরা পর্বতারোহী। এই কম বয়সেই তার ঝুলিতে বেশ কিছু কঠিন এক্সপিডিশনের সাফল্যের সার্টিফিকেট আর মেডেল ঢুকেছে। তবে গতবারের হাতিপাহাড় অভিযানের কথা রুদ্রর সারাজীবন মনে থাকবে। এখনো পা'টা দপ দপ করে। খুব ভাগ্য তার যে বড়সড় কোনরকম ক্র্যাক হয়নি। তাহলে পাহাড়ের ওঠা বাকি জীবনের জন্য স্বপ্নই হয়ে যেত।

বাইকটা নিয়ে রাস্তায় নামলো রুদ্র। এই পাঁচঘরা থেকে গড়িয়াহাট যেতে ঘন্টাখানেক তো লাগবেই। এত ভোরে জ্যাম জট না থাকার সম্ভবনাই বেশী। রুদ্র ফুলস্পিডে বাইক চালাল।

ঠিক ঠাক সময়েই গোপালাচারীর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেল রুদ্র। গোপালাচারী তার দোতলার ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন রুদ্রর জন্য। রুদ্রকে দেখে গোপালাচারী নিচে নেমে এলেন। "আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে? তোমার পা কেমন আছে?" রুদ্র হেলমেট খুলতে খুলতে ঘাড় নাড়ল। "ভালোই আছে। তবে ডাক্তার এখনো কয়েক মাস পাহাড়ে উঠতে বারন করেছে। তাই আমি একটা ছোটদের গ্রুপ নিয়ে পুরুলিয়া যাচ্ছি হপ্তাখানেক বাদে।"

"বাহ খুব ভালো।"

গোপালাচারীর ফ্ল্যাটটা বেশ বড়সড়। তিনটে বেডরুম। অ্যাপার্টমেন্টের সামনে খানিকটা ফাঁকা জমি। তাতে বেশ কয়েকটা বড় বড় গাছ। একটা গাছ বসার ঘরটাতে একদম আলো ঢুকতে দিচ্ছে না। রুদ্রকে

বাইরের ঘরে বসিয়ে গোপালাচারী কোথায় যেন গেছিলেন। রুদ্র একটু উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল ফ্ল্যাটকে। তিনটের মধ্যে একটা ঘরেই শুধু বিছানা পাতা। তাতে কেউ একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। অন্য দুটো ঘরে বইপত্র আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। একটা টেবিলে প্রচুর তার আর সার্কিটের পাহাড় জমে আছে। পড়ার ঘরটায় প্রচুর বই। নিরানব্বুই ভাগ ইংরাজী। অন্য আরেকটা টেবিলের উপরে একটা ল্যাপটপ আর কাগজের পাহাড়। সোফার পাশে একটা ছোট টেবিলে কিছু ম্যাগাজিন আছে দেখে রুদ্র একটা তুলে নিল, কিসব জটিল বিজ্ঞান নিয়ে খটোমটো ইংরাজীতে আলোচনা দেখে বিমর্ষ হয়ে আবার নামিয়ে রাখল। ঠিক তখনই রুদ্রর চোখে পড়ল একটা গোল্ডেন রিট্রিভার। রুদ্র কুকুর খুব পছন্দ করে। বাড়ীতে মায়ের জন্য সে পুষতে পারেনি। তাও বাড়ীর বাইরের বাগানে রাত্রে অন্ততঃ দশটা নেড়িকুকুর ঘুমায়। এই জন্য তাদের বাড়ীতে কখনো চোর ঢোকে না। সে চুক চুক করে ডাকল কুকুরটাকে। কাছে আসতে রুদ্র ওটাকে কোলে তুলে নিল। বড় বড় মোলায়েম লোমে রুদ্র কিলিবিলি দিতে লাগল। কুকুরটা রুদ্রর গাল চাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। "সোনাই তোমাকে ডিস্টার্ব করছে না তো?", গোপালাচারী ঘরে এসে ঢুকলেন। সোনাই রুদ্রর কোল ছেড়ে গোপালাচারীর দিকে ছুটে গেল।

"চল, ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। খেতে খেতে কথা হবে।"

খেতে খেতে গোপালাচারী একটা অদ্ভুত গল্প শোনালেন। কিছুদিন আগে তার খড়গপুরের বাড়ীতে একটা বাচ্চা ছেলে এসে উপস্থিত। ছেলেটা কমবয়স্ক, ন্যাড়ামুন্ডী, পাহাড়ী এবং তার পরনে ছিল লাল চাদর আর হলুদ জামা।

"লামা!" সবিস্ময়ে বলে ওঠে রুদ্র।

"হ্যাঁ লামা। যারা ঐ তিব্বতী গুম্ফাগুলোয় থাকে।" গোপালাচারী বললেন। "ও নিজের নাম বলল পেমা দোরজে।"

পেমা দোরজে একদিন খুব ভোরে গোপালাচারীর খড়গপুরের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তার তখন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। গোপালাচারী তাকে নিয়ে ডাক্তার বদ্যি করলেন কিছু দিন। তারপর ছেলেটা কথা বলার অবস্থায় পৌঁছলে পেমা গোপালাচারীকে একটা ডাইরী, অনেক কাগজ আর একটা চিঠি দেয়, আর বলে যে সে দ্রিরাপুক গুম্ফা থেকে আসছে, লিপুলেখ পাস ধরে সে ঢুকেছে ভারতে।

"দ্রিরাপুক? বলেন কি? সে তো মানস সরোবরের ওখানে না? আর লিপুলেখ পাস তো অত্যন্ত দুর্গম রাস্তা?" গোপালাচারীকে থামিয়ে রুদ্র বলে উঠল।

গোপালাচারী ঘাড় নাড়লেন, "ছেলেটা তো তাই বলল। সত্যি বলতে কি এসব আমি জানি না। দ্রিরাপুক গুম্ফা কোথায়! লিপুলেখ পাস দুর্গম কিনা আমার জানা নেই।"

"কিন্তু আপনার কাছে কেন?"

"লামাটা যে কাগজপত্রগুলো আমাকে দিয়েছে তার থেকে আমি কিছুটা আভাস পেয়েছি। এখন তোমার সহায়তা ছাড়া আমি পুরো কাজটা কখনই করতে পারব না।"

"কি কাজ?" চামচে দিয়ে ডিম ভাজা কাটতে কাটতে রুদ্র প্রশ্ন করল।

"তোমাকে হাতিপাহাড়ে সোলার ফ্লেয়ারের গল্প বলেছিলাম মনে আছে?"

"হ্যাঁ আছে।"

"তাহলে শোন। আমার এক পুরনো বন্ধু কোন এক জটিল জিনিস নিয়ে তিব্বতে কোন এক অঞ্চলে কিছু একটা কাজ করছে। মোস্ট প্রব্যাবলি সেটা মানস সরোবরের ওইখানে কোথাও। সেটা কি কাজ। কি জিনিস আমি জানি না। তবে ওর উপরে আমার বিশ্বাস আছে। ও আমাকে গত বছর পুজো থেকে চিঠি লিখছে। তাতে করে আমার মনে হয়েছে যে ওর যন্ত্রগুলোও সোলার ফ্লেয়ারে নষ্ট হয়ে গেছে। ও আমাকে যে

ছবিগুলো পাঠিয়েছে সেগুলো বিভিন্ন জটিল সার্কিট বোর্ড সম্বলিত এক জটিল যন্ত্রের কিছুটা অংশের ডায়াগ্রাম। ও আমাকে ঐ সার্কিটগুলো তৈরি করে ওর কাছে নিয়ে যেতে বলেছে। এই যন্ত্রের অংশটা তৈরী করতে প্রায় আট দশ মাস সময় লাগবে। বিদেশ থেকে অনেক সুক্ষ্ম অংশ বানিয়ে আনতে হবে। তবে আশা করছি যে যন্ত্রটা অগাস্টের মধ্যেই আমি বানিয়ে ফেলতে পারব। সেপ্টেম্বর মাসে আমরা মানস সরোবর যাবো।"

রুদ্র অবাক হয়ে তাকাল প্রোফেসরের দিকে, "আমরা মানে?"

"আমি আজ অবধি কোন পাহাড়ি এলাকায় একলা গেছি নাকি?", কপট রাগে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রোফেসর।

"কিন্তু সেখানে যেতে তো অনেক খরচ?"

"খরচের দায়িত্ব সব আমার। তুমি খোঁজ খবর নাও। ব্যবস্থাপনা কর। জুলাইয়ের আগে আমি দেশে ফিরতে পারব না হয়ত। এখানকার সব দায়িত্ব তোমার।"

"কিন্তু আপনি মানস সরোবর যেতে চাইছেন কেন? যন্ত্রটা তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেই তো সমস্যা মিটে যায়।"

"না। কেইন বলে দিয়েছে যে সেপ্টেম্বরের আগে সম্ভব নয়। ওই সময় দলাই লামা আসবেন নেপালে। কেইন কিছু একটা ব্যবস্থা করে রাখবে যাতে করে যন্ত্রাংশটা নেপাল থেকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়া যায়। এমনিতেই ইন্দোচীন বর্ডারে চেকিং বড্ড কড়া। আর এছাড়াও আমি যন্ত্রটাকে নিজের চোখে একবার দেখতে চাইছি। এত সুক্ষ্ম যন্ত্র কিভাবে কেইন বানালো ঐ দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বসে। কে ওকে জিনিস সাপ্লাই দিল?" প্রোফেসর সামান্য আনমনা হয়ে গেলেন।

"কেইন কে?"

"ওই আমার বন্ধু। পুরো নাম কেইন সযেৎস্নে। পেমা বলল ওরা নাকি ওকে কাঞ্চেন লামা বলে জানে। কেইন সযেৎস্নে থেকে কাঞ্চেন, খারাপ নয়! পেমার মাস্টার। পেমা দেখলাম মানুষটাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার। পেমা এখন এখানেই থাকবে। ও সেপ্টেম্বরে আমাদের সাথে ফিরে যাবে তিব্বতে। ওর শরীর বড়ই দুর্বল। কিন্তু আমি তো বিদেশ চলে যাচ্ছি ওকে কোথায় রেখে যাব কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো ও আমাদের বাড়ীতে থাকতেই পারে।"

গোপালাচারীর উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। "আমি জানতাম রুদ্র তোমার উপরে ভরসা করা যায়। আচ্ছা দাঁড়াও পেমাকে ডেকে আনি।"

রুদ্র একটু বিপাকে পড়ল। সে আজ সারাদিন এদিক ওদিক ঘোরার প্ল্যান নিয়ে বেড়িয়েছে। এখন একটা অসুস্থ বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সে কোথায় যাবে? রুদ্রর ভাবন্তর লক্ষ্য করলেন প্রোফেসর। "কি ব্যাপার রুদ্র?"

"না সেরকম কিছু না। আজকে আমি কয়েকটা জায়াগায় যাব ভেবেছিলাম।"

"জরুরী কিছু?"

"না না। জরুরী নয়। ছাড়ুন। ও পরে গেলেও হবে। আপনি কখন বেরোবেন বাড়ী থেকে?"

"এই ধর আরো দু ঘন্টা পরে।"

"আচ্ছা তবে আমি একবার ডাক্তারকে পা'টা দেখিয়ে আসি। দু ঘন্টার মধ্যে আমি এসে ওকে নিয়ে যাব। এখন ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। ডাকতে হবে না।"

"ঠিক আছে রুদ্র।"

রুদ্র হেলমেটটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। "বাকি কথা তাহলে আমি আসার পরে হবে।" গোপালাচারীর সাথে হ্যান্ডশেক করে রুদ্র দরজার হাতলে হাত রাখতেই হঠাৎ কলিংবেলটা বেজে উঠল।

প্রোফেসর বললেন, "ঐ ঋতিকা এল বোধহয়।"

দরজা খুলতেই রুদ্র দেখল, একটা ছিপছিপে নাতিদীর্ঘ মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চশমা, ঘাড় অবধি থোকা থোকা চুল। চোখে মুখে বুদ্ধি আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

প্রোফেসরকে বিদায় জানিয়ে রুদ্র রাস্তায় নেমে এল।

লামাটার পরনে এখন একটা গেঞ্জি আর ফুল প্যান্ট। গোপালাচারী কিনে দিয়েছেন। সবসময় ওই রকম গাঢ় লাল কাপড় লোকের চোখ টানে বড়। ছেলেটা যে লামা এখন তাকে দেখলে তা বোঝাই যাচ্ছে না। চোদ্দ পনের বছরের ছেলেটা একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে বসে ছিল প্রোফেসরের বাইরের ঘরে। অপেক্ষা করছিল রুদ্রর জন্য। প্রোফেসর তাকে রুদ্রর কথা বলে রেখেছিল। তাই রুদ্র যখন কলিংবেল বাজাল তখন পেমাই তাকে দরজা খুলে দিল, ভাঙ্গা ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করল, "আপনি রুদ্র?"

রুদ্র দেখলে একদম ন্যাড়ামুন্ডি, ফর্সা, লাল লাল আপেলের মত গাল, ছোট ছোট চোখ দুটো দুষ্টুমি মাখানো, উঁচু হনু, শক্ত চোয়াল, লম্বাটে মুখের এক সদ্য কিশোর ছেলে। পার্বত্য রুক্ষ আবহাওয়া তার মুখের লাবন্য কেড়ে নিয়েছে। প্রচন্ড ঠান্ডার দেশে থাকলে চামড়া যেভাবে পুড়ে তামাটে হয়ে যায়, শুষ্ক হয়ে যায় মুখের চামড়া ছেলেটার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘ দুর্গম রাস্তা পার করার ধকল তার চোখে মুখে স্পষ্ট।

লামাটা অর্ধেক দেহ ঝুঁকিয়ে রুদ্রকে অভিবাদন জানাল। রুদ্র জিজ্ঞেস করল, "এখন তোমার শরীর কেমন আছে?" লামাটা ঘাড় নেড়ে ভালো জানালো। গোপালাচারী ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "এই তো রুদ্র এসে গেছে। পেমার সাথে তোমার আলাপ করে দি।"

রুদ্র হাসল, পেমার কাঁধে হাত রেখে বলল আলাপ তাদের হয়ে গেছে। এই কষ্টসহিষ্ণু বাচ্চা ছেলেটাকে দেখে তার এখনই ভালো লেগে গেছে। লিপুলেখ পাস পায়ে হেঁটে পার করতে অনেক বড় বড় ট্রেকাররাও চায় না। সেখানে এই কিশোর ছেলেটা একটা জিনিস এক অচেনা মানুষের হাতে তুলে দেবে বলে প্রান হাতে করে নেমে এসেছে। নাহ এই ছেলের মানসিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করা অন্ততঃ রুদ্রের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ভেতরের ঘর থেকে চশমা পরা থোকা চুলের মেয়েটা বেড়িয়ে এল। রুদ্র একটু অবাক হল প্রায় দু ঘন্টা ধরে গোপালাচারী এই মেয়েটার সাথে কথা বলছেন। গোপালাচারী হাসিমুখে বলল, "দেখ আজ আমার ঘরে তিন তিনজন অতিথি কিন্তু তাঁদের কেউকেই আমি লাঞ্চের নিমন্ত্রন করতে পারছি না।"

তিন অতিথির মুখেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

।। চার।।

ঋতিকা। ঋতিকা প্যাটেল। পরনে জিন্স আর কামিজ, চোখে রিমলেস চশমা, থোকা থোকা চুল এয়ার কন্ডিশনের বিনবিনে হাওয়ায় উড়ছে। মধ্য কলকাতার এক কফিশপে বসে অনেকক্ষন ধরে এক মনে কফিতে কাঠি দিয়ে বিরক্তি গুলছিল সে। চক্রেশ এখনো এসে পৌঁছায়নি। প্রায় একঘন্টার কাছে হতে চলল। আজকেও কি দেখা করাটা ক্যানসেল করবে শেষমেশ! বেশ কিছুদিন ধরেই সে আর চক্রেশ দেখা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু না কিছু কাজ এসে আটকে দিচ্ছে দুজনকেই। দু হপ্তা আগে ঋতিকা অতিকষ্টে একটা দিন বার করেছিল, কিন্তু চক্রেশের অফিস থেকে ছাড়ল না শেষমেশ। ঋতিকার এখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। পেপারটার জন্যই এই হাল ঋতিকার। পেপারটা একবার পাবলিশ হয়ে গেলে চাপটা একটু কমবে। কিন্তু পি

এইচ ডি টা যে কবে শেষ হবে তা ভগবানই জানে। খানিকটা বিরক্তি নিয়ে ঋতিকা স্ট্রয়ে ঠোঁট ডোবাল। বাইরে বিকেলের বিশ্রী চড়া রোদ। দেওয়ালের কাঁচ ভেদ করে রোদটা হাতের চামড়ায় এসে লাগছে ঋতিকার। উফ কলকাতায় এই জুলাই মাসটায় কিছু গরম হয় বটে। কি বিশ্রী! ঠাণ্ডা কফি খেতে খেতে হাবিজাবি চিন্তা মাথায় ঘুরছিল ঋতিকার। এই সময় ঝুপ করে চক্রেশ এসে বসল সামনের চেয়ারটায়।

"কি ব্যাপার এত দেরি করলে তুমি?", বিরক্তিটা গোপন রাখতে পারল না ঋতিকা।

"অফিসের অবস্থা তো তুমি জানো। তার উপর এত জ্যাম চতুর্দিকে।", চক্রেশ বিরক্তিটা একটা মনভোলানো হাসি দিয়ে ঢেকে দিল।

এইজন্যই চক্রেশকে ঋতিকার এতো ভালো লাগে। কোন ব্যাপারে বিরক্তি নেই তার। সবসময় হাসিখুশি। চক্রেশের পুরো নাম চক্রেশ যাদব। ও কতদিন এই রাজ্যে আছে ঋতিকা জানে না কিন্তু চক্রেশের বাংলায় এতটুকু দেশোয়ালী টান পর্যন্ত নেই। ঋতিকারা এক প্রজন্ম আগে গুজরাট থেকে এসে কলকাতায় ব্যবসা করা শুরু করেছিল। ঋতিকা জন্ম থেকে বাংলা ভাষা শুনে এলেও তার কথায় একটা অস্পষ্ট টান চলে আসে মাঝেমাঝেই।

দু'মাস আগে এক বান্ধবীর সঙ্গে ঋতিকা এই কফিশপেই আড্ডা দিতে এসেছিল। এসেছিল সন্ধেবেলায়। ঘন্টাখানেক কাটিয়েই যে যার বাড়ীর দিকে রওনা দেবে এমনটাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সন্ধের পর থেকেই শুরু হল তুফান বৃষ্টি। কফিশপেই আটকা পড়েছিল তারা প্রায় রাত নটা পর্যন্ত। এর মধ্যে চারটে অভব্য ছেলে এসে তাদের খুবই বিরক্ত করছিল। কফিশপ ফাঁকা। একটা মাত্র মেয়ে সেলসগার্ল ছিল সেদিন। পরিস্থিতি দেখে তারও মুখ শুকিয়ে গেছিল ভয়ে। তবে সেদিন চক্রেশ প্রায় দেবদূতের মত নেমে এসেছিল ওর জীবনে। চারটে ছেলেকে একা হাতে মহড়া নিতে বাস্তব জীবনে কখনো কাউকে দেখেনি ঋতিকা। সেই থেকেই চক্রেশের সাথে তার আলাপ। বাস্তববুদ্ধির সাথে সাথে হিউমার সেন্সও অত্যন্ত ভালো চক্রেশের। গত দু'মাস ধরেই তারা একে অপরের কাছের বন্ধু হয়ে উঠেছে।

এমনকি চক্রেশ তার বাড়ীতেও ঘুরে এসেছে। এত কম সময়ের আলাপে এর আগে কোন বন্ধুকে ঋতিকা কখনো বাড়ীতে নিয়ে যায়নি। কিন্তু চক্রেশের কথা আলাদা। তার উপর ভরসা করা চলে। মাত্র দু এক ঘন্টার মধ্যেই চক্রেশ ঋতিকার বাড়ির লোককেও আপন করে নিয়েছে। এখন ঋতিকা যদি বলে যে সে চক্রেশের সাথে কোথাও যাচ্ছে তাহলে বাড়ী থেকে আর আপত্তি করে না। এমনকি রিসার্চের কাজে যদি ঋতিকাকে দু তিনদিনের জন্য দূরে কোথাও যেতে হয় তাহলে তার মা নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করে যে চক্রেশ তার সাথে যাচ্ছে কিনা।

আপাতত ঋতিকার মনটা খুবই খিঁচড়ে আছে। কিছুদিন ধরেই সে পড়াশুনায় মন দিতে পারছে না। তার গবেষনারও বড্ড ক্ষতি হচ্ছে। দিন দুয়েক আগেই একটা দামী সার্কিট সে পুড়িয়ে ফেলছে। স্যর বেজায় রেগে গেছেন তার উপরে। সে যে বিষয়টা নিয়ে গত দু বছর ধরে লড়াই করে পেপার লিখল, সেটা এই হপ্তা দুয়েক আগে একটা জাপানী না চিনা ছেলে পাব্‌লিশ করে দিয়েছে। আবার ঋতিকাকে নতুন করে কাজকর্ম করতে হবে। এই ঘটনাটা সে চক্রেশকে বলার সময় পর্যন্ত পায়নি। সেইজন্যই তার আরো বিরক্ত লাগছিল।

"কি নেবে বললে না তো?"

"তুমি কি খাচ্ছো? কোল্ড কফি? আমার জন্যও একটা বল তাহলে।" -বলতে না বলতেই চক্রেশের একটা ফোন এল। কান খাড়া করে ঋতিকা দু চারটে কথা শুনে নিশ্চিন্ত হল। না এক্ষুনি পালাবে না ছেলেটা। অর্ডার আর টাকাটা দিয়ে ঋতিকা বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দিল তার দেরি হবে।

পেপার পাবলিশিং নিয়ে ঋতিকার গরম গরম বাক্যগুলো শুনতে শুনতে চক্রেশ ঠাণ্ডা কফি খাচ্ছিল। তার মুখে সুক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠছে। অথচ ঋতিকার সামনে হাসা যাবে না। এখন ঋতিকা তার দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছে, এই সময় হাসা উচিতই নয়। চক্রেশ মাথা নিচু করে কফি খেতে লাগল।

পুরো ঘটনাটা বলার পরে ঋতিকা সামান্য ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে হেলান দিল, খর চোখে তাকাল চক্রেশের দিকে, "কিছু শুনলে?"

ন্যাপকিনে মুখ মুছে চক্রেশ চওড়া করে হাসল, "অবশ্যই শুনেছি। তবে এতে তোমার চিন্তার কি আছে?"

"পুরো ব্যাপারটাই তো চিন্তার। আমার পেপার পাবলিশিং অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে গেল। তুমি জানো মিনিমাম তিনটে জার্নাল পেপার আর একটা কনফারেন্স না হলে ডিগ্রী পাওয়া যাবে না। আমি এখনো একটাও পেপার বার করতে পারিনি।" ঋতিকা দু হাতে মুখ ঢাকল।

"একী তুমি ভেঙে পড়ছ নাকি? না না আমি তার জন্য বলিনি চিন্তার কথা নেই, আমি একটা অন্য জিনিস ভাবছিলাম।" চক্রেশ ঋতিকার কাঁধে হাত রাখল, "ভেঙে পড়ার কি আছে? তোমার পেপার ঠিক বেরোবে।"

একটা ছেলে এসে কোল্ড কফি রেখে গেল টেবিলে।

"কি ভাবে বেরোবে?" ঋতিকা সামান্য রাগের গলায় বলল, "আজ প্রায় দুমাস হতে চলল আমার স্যর বিদেশে গিয়ে বসে আছেন। প্রোফেসর গোপালাচারীর তো কোন পাত্তাই নেই আর। উনি তাও আমাকে বিপদে আপদে একটু সাহায্য করতেন।"

"আমি ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

"কি?"

"তুমি প্রোফেসরের কাছ থেকে ওই যে তুমি কীসব যন্ত্রপাতির কথা বলছিলে না সেই যন্ত্রের ব্যাপারে পেপার লেখো। তাহলে প্রোফেসর গোপালাচারীও তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

"প্রোফেসরের নিজস্ব আবিষ্কার ওটা। ওটা উনি কেন আমাকে দেবেন?"

"পুরোটার কি দরকার? তোমার সাবজেক্টের সাথে যেটুকু ম্যাচ করে ওইটুকুর উপর হেল্প নাও।"

"প্রোফেসর হেল্প করবেন কি না বুঝতে পারছি না।" দ্বিধাজড়িত কণ্ঠস্বরে বলল ঋতিকা, "আমি তো ওনার স্টুডেন্টও নই।"

"আরে করবেন হেল্প। তোমার কথা শুনে বুঝেছি উনি তোমাকে খুবই স্নেহ করেন।" কফির তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিল চক্রেশ। "তুমি ওর আন্ডারে পি এইচ ডি টা করলে না কেন?"

"আমার কপাল। ওর ইনটেক তখন ফুল হয়ে গিয়েছিল। অ্যাক্চুয়ালি উনিই আমাকে আমার স্যরের কাছে রেফার করেছিলেন। দুজনের ফিল্ড তো প্রায় একই।" সামান্য উত্তেজিত হয়ে ঋতিকা গলা নামাল, "জানো তো দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি। তবে সত্যি বলতে কি প্রোফেসর গোপালাচারীর কাছে আমার স্যার বিশেষ পাত্তা পাবে না।"

চেয়ারে থেকে উঠতে উঠতে চক্রেশ নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"আরে ওনার পড়াশুনার লেভেলটাই বিশাল। তারপরে নিজের কাজের প্রতি খুব নিষ্ঠাবান। আমার স্যরের মত খালি প্রোজেক্ট আর টাকার পিছনে ছোটে না। ওই প্রোজেক্ট করে করেই স্যারের সব জলে গেল। আর এছাড়াও গোপালাচারীকে তুমি জিনিয়াস বললেও কম বলা হবে। ওনাকে ইলেকট্রনিক দুনিয়ার একজন উইজার্ড বলতে পারো তুমি। শুধু কি ঈর্ষা করলেই হবে।"

দুজনে বেরিয়ে এল রাস্তায়। সূর্যের ঝাঁঝ কমে এসেছে অনেকটাই। চক্রেশ বলল, চলো একটা ট্যাক্সি ধরে ময়দানের দিকে যাই।

বড় রাস্তায় বেরোতেই ওরা একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। দুজনে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। হঠাৎ ঋতিকা চক্রেশের হাত আঁকড়ে ধরল। "আমার না মাথাটা ঘুরছে।"

"সে কি!" বলতে বলতেই চক্রেশ টের পেল ট্যাক্সিটাই কেমন যেন দুলছে। সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তার লোকজন কেমন যেন সচকিত হয়ে স্থির হয়ে পড়ছে। দুলুনিটা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে। চক্রেশ খানিকদূরে একটা হাইরাইজের মাথাটাকে সচক্ষে দুলতে দেখল। ট্যাক্সির ড্রাইভার আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, "ভূমিকম্প, ভূমিকম্প।" গাড়ীটা দিকভ্রষ্ট হয়ে সোজা পাশের একটা বিশাল বহুতলের দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারল। কিছুক্ষনের জন্য চক্রেশের চোখে অন্ধকার নেমে এল।

জ্ঞান ফিরতেই সে দেখল তারা গাড়ীর মধ্যে আটকা পড়ে আছে। ট্যাক্সিটার সামনেটা একদম তুবড়ে গেছে। ড্রাইভারটাকে পর্যন্ত গাড়িটার ছাদ থেকে আলাদা করা যাচ্ছেনা। ঋতিকারও মাথা জোরে ঠুকে গেছিল। তার নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চক্রেশ ঋতিকাকে ধরে নাড়াল। ঋতিকা অজ্ঞান হয়নি তবে আহত হয়েছে। চক্রেশ গাড়ির দরজাটা খুলে রাস্তায় নেমে এল। উপর দিকে তাকিয়ে দেখল চারতলার একটা ব্যালকনি বিপদজ্জনক ভাবে খুলে এসেছে বাড়ীটার থেকে। সেটা ঝুলছে ট্যাক্সিটার ঠিক মাথার উপরেই। ব্যালকনি থেকে একটা ফুলের টব রেলিং গলে এসে ট্যাক্সির মাথায় পড়ল। ঋতিকা চিৎকার করে উঠল।

চক্রেশ দ্রুত উঁকি দিল ট্যাক্সির মধ্যে, "বেড়িয়ে এসো। কি করছ?"

"বেরোতে পারছি না আমি। আমি আটকে গেছি। চক্রেশ পিজ হেল্প মি।" ঋতিকা পাগলের মত হাত বাড়ালো চক্রেশের দিকে।

চক্রেশ ছুটে এল অন্য দরজায়। দরজাটা তুবড়ে আটকে গেছে খোলা যাচ্ছে না কিছুতেই। চক্রেশ কিছুক্ষণ টানাটানি করে ব্যর্থ হল। আবার উল্টো দিকের দরজায় এসে ভেতরে ঢুকে দেখতে চাইল ঋতিকার অবস্থাটা। ট্যাক্সির সামনেটা দেওয়াল ভেঙে পড়ে পিষে গেছে পুরো। সামনের দিকের সিটটা ভেঙে পিছিয়ে এসেছে। ঋতিকার কোমর থেকে নিচের অংশ পুরোটাই আটকে গেছে সামনের সিটের তলায়। সে একটুও নড়তে পারছে না। চক্রেশ একটু উদভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইল ঋতিকার দিকে। ট্যাক্সিটার মাথায় আবার কি একটা সশব্দে খসে পড়ল। ঋতিকা ভয়ে কেঁদে উঠল। চক্রেশ এক লাফে ট্যাক্সির বাইরে বেড়িয়ে এল।

"চক্রেশ প্লিজ আমাকে ছেড়ে যেও না।" ঋতিকা উদভ্রান্তের মত চক্রেশের জামা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল।

"আমি এক্ষুনি আসছি। একলা পারব না গাড়ীটা সরাতে। লোক নিয়ে আসছি।" চক্রেশ দ্রুত মিলিয়ে গেল ঋতিকার চোখের আড়ালে। চারিদিকে ধুলোতে ভর্তি হয়ে উঠছে। ঋতিকা চেঁচাতেও পারছে না। ধূলোয় তার গলা শুকিয়ে গেছে, আওয়াজের বদলে কাশি উঠে আসছে গলা দিয়ে। ঋতিকা পাগলের মত ঠেলতে লাগল সামনের সিটটাকে। উপর থেকে খসে খসে পড়ছিল বহুতলের প্লাস্টারের বড় বড় চাঙড়। ঋতিকা দেখল একটু দূরে একটা পলায়মান লোকের উপর দুম করে একটা লোহার রড সমেত সিলিং-এর বেশ খানিকটা অংশ এসে পড়ল। লোকটা চাপা পড়ে গেল তার তলায়। শুধু নিথর একখানা পা বাইরে দেখা যাচ্ছিল। চারিদিক থেকে একটা তীব্র শব্দ উঠছে। ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে রাস্তা।

একটা বাইক এসে থামল ঋতিকার জানালার পাশে। হেলমেট পরা লোকটা চট করে নেমে এল। ঋতিকাকে জিজ্ঞেস করল কি অবস্থা। ঋতিকা কোনরকমে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল যে তার পা আটকে গেছে সে একটুও নড়তে পারছে না। লোকটা একবার ঘাড় উঁচু করে দেখল ঝুলন্ত ব্যালকনিটাকে। বিপজ্জনক অবস্থা। যে কোন সময় ব্যালকনিটা আছড়ে পড়বে গাড়ীটার উপর। লোকটা ঘাবড়াল না। সে ঠান্ডা মাথায়

দেখল ট্যাক্সিটাকে। গাড়িটার সামনের অংশটা একেবারে দুমড়ে গেছে। কিন্তু পিছনের অংশটা একদম ঠিক আছে। লোকটা বাইকের টুলবক্স খুলে একটা ছোট গিয়ার চেঞ্জের যন্ত্র বের করল। সেটা দিয়ে সে পিছনের চাকার হাওয়াটা খুলে দিল। ঋতিকার সিটটা খানিকটা নেমে এল। ঋতিকা হিঁচড়ে সিটের তলা থেকে বডিটা বের করে আনল। তার জিন্সটা কিসে যেন আটকে যাচ্ছে। লোকটাকে সে কথা বলতেই লোকটা উঠে এল গাড়ীর মধ্যে। একটা ছোট ছুরি দিয়ে কেটে দিল জিন্সের তলার অংশ। ঋতিকা পা'টা কোন রকমে বের করা আনল। লোকটা তাকে দ্রুত টেনে বার করল গাড়ির মধ্যে থেকে। কোনরকমে হিঁচড়ে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল বাড়ীটার থেকে দূরে। ঋতিকা বিস্ফারিত চোখে দেখল লোকটা আবার ছুটে গেল আর বাইকটা নিয়ে সরে আসতেই উপর থেকে হুড়মুড় করে বাড়ীর একাংশ নিয়ে ধ্বসে পড়ল ব্যালকনিটা।

আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলেই যে কি হত ঋতিকা ভাবতেই পারছে না। লোকটা ধুলোয় চাপা পড়ে গেছিল। তার কোন ক্ষতি হয়নি। বাইকটা নিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল ঋতিকার দিকে। চাপা স্বরে বলল, "উঠে পড়ুন।" ঋতিকা কালবিলম্ব করল না। বাইক ছোটাতে ছোটাতে লোকটা ঋতিকার বাড়ীর ঠিকানাটা জানল। ঋতিকার বাড়ী বেশি দূরে নয়। রাস্তা ঘাটের হাল দেখে ঋতিকা শিউরে শিউরে উঠছিল। বেশ কিছু বাড়ী সম্পূর্ন ভূমিশয্যা নিয়েছে। রাস্তা ঘাটে লম্বা লম্বা ফাটল। অচল গাড়ী ভিড়র, ল্যামপোস্ট আর গাছ উলটে পড়ে আছে তারমধ্যে। লোকটা সত্যি ভালো গাড়ী চালায়। চতুর্দিকের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে বাইকটাকে সে ঠিক কাটিয়ে কাটিয়ে বার করে নিয়ে যাচ্ছে।

"আপনার বাড়ী কোথায়?", গড়িয়ায় বাড়ীর সামনে নেমে ঋতিকা কথা বলতে পারল।

"পাঁচঘরা।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার নামটা ..."

"আপনি আমাকে চেনেন। প্রোফেসর গোপালাচারীর বাড়ীতে আমাদের দেখা হয়েছিল। আমার নাম রুদ্রশংকর।"

রুদ্র বাইক ছোটাল। ঋতিকার মা বাবা ছুটে এসেছেন। তাঁদের বাড়ীর একাংশ নষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা নিজেরা সেরকম আহত হননি।

রুদ্র পারলে বাইকটাকে আকাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বাড়ীতে কেউ তার ফোন ধরছে না। কি অবস্থা বাড়ীর! আজকেই কেন যে সে বেরোল বাড়ী থেকে। নিজেই নিজেকে দুষছিল রুদ্র। বুড়ো বাবা মা আর একটা বাচ্চা ছেলে আছে বাড়িতে। কলকাতায় ভূমিকম্পের যেরকম প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখেছে রুদ্র তাতে তার দম আটকে আসছে। রুদ্র পাগলের মত বাইক চালাতে লাগল।

গেটের কাছে বাইকটা রেখে দু পা ভেতরে ঢুকতেই সে বুঝল তার আর কিছু করার নেই। উত্তর দিকের খান দুই নতুন বানান ঘর ছেড়ে পুরো বাড়ীটাই নেমে এসেছে মাটির সমতলে। আশেপাশে বেশ কয়েকজন লোক জটলা করেছিল। ধ্বংসস্তুপের ভেতরে আটকা পড়ে গেছে রুদ্রর মা আর বাবার দেহ। তারা দুজনেই মারা গেছেন। পেমাকে উদ্ধার করা গেছে। সে ভালো মতো আহত হয়েছে। রুদ্র ভিড় ঠেলে পেমার কাছে গেল। পেমার হাতে মাথায় ব্যান্ডেজ। সে কাছে আসতেই পেমা তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, "আমি পারলাম না রুদ্রদা।" পেমাকে জড়িয়ে ধরে রুদ্র হু হু করে কেঁদে ফেলল।

।। পাঁচ।।

ছাত্র পড়াতে পড়াতে ঋতিকা ভাবছিল এক কথা সত্যি যে প্রকৃত দুঃসময় ছাড়া মানুষ চেনা যায় না। যে ছেলে বিপদের সময় তাকে ফেলে পালিয়ে যায় তার উপরে ভরসা করা মূর্খামি। যদিও চক্রেশ পরে তাকে ফোন করে প্রচুর ক্ষমা টমা চেয়েছে। বলেছে যে সে বুঝতে পারেনি। লোক নিয়ে ফিরে এসে সে দেখে যে ব্যালকনিটা ধ্বসে পড়েছে। কিন্তু ঋতিকা মোটেও আর চক্রেশকে বিশ্বাস করেনি। এই ভূমিকম্পের পরে পরেই গোপালাচারী কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তিনি ঋতিকাকে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। তার উপরে ভিত্তি করে ঋতিকা গত দু'মাসে যে পেপারটা খাড়া করেছে সেটা এক বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল গ্রহন করেছে।

ছাত্রের পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে ঋতিকা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। মাস দুয়েক আগে তার সঙ্গে যখন প্রোফেসর গোপালাচারীর দেখা হয় তখন প্রোফেসরকে একটু কেমন যেন দেখাচ্ছিল। মনে হল প্রোফেসর যেন ভয় পেয়েছেন। তাকে অন্যান্য কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ করেই বলে বসলেন, আমার কিছু হয়ে গেলে আমার কাজ কি শেষ হবেনা ঋতিকা? তোমার উপরে আমি অনেক ভরসা করি। প্রোফেসরের কেন কিছু হবে ঋতিকার সেটা মাথায় ঢোকেনি। হবে হয়ত ভূমিকম্প এই ধ্বংসলীলা দেখে প্রোফেসর শকড্ হয়ে গেছেন।

ঋতিকার স্যরও ফিরে এসেছিলেন গোপালাচারীর প্রায় সাথেই। ঋতিকার সাথে কথা হতে, ঋতিকা প্রোফেসর গোপালাচারীর সাহায্যের কথাটা একটু কিন্তু কিন্তু করেই স্যরকে জানাল। ঋতিকা খুব অবাক হয়ে দেখল স্যর মোটেও অন্যবারের মত রাগ করলেন না, বরং বললেন যেহেতু উনি এখন বিভিন্ন কাজে ঘন ঘন বিদেশ যাবেন তাই ঋতিকা যেন প্রোফেসর গোপালাচারীর আন্ডারেই কাজগুলো করতে থাকে। সেরকম হলে পেপারে গোপালাচারীর নাম দেওয়া যাবে। ঋতিকা জানে প্রোফেসর গোপালাচারী মোটেও নামের জন্য উদগ্রিব নয়। আর তার আন্ডারে কিছু দিন কাজ করাও খুব ভালো। ঋতিকার কাজটা অন্ততঃ এগোবে খানিকটা। ঋতিকা খবরটা গোপালাচারীকে জানিয়েছিল। গোপালাচারী সেইমত তাকে সাহায্যও করেছেন। কিন্তু দিন দুয়েক আগে গোপালাচারী তাকে বলল যে তিনি নাকি মাসখানেকের জন্য কোন এক পাহাড়ে যাবেন তাঁর যন্ত্রের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য। গোপালাচারী চলে যাবার আগের দিন দুপুরে অফিস রুমে ঋতিকা যখন দেখা করতে গেছিল তখন প্রোফেসরকে প্রচন্ড ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল। তিনি প্রায় ফিসফিসিয়ে ঋতিকাকে তার সাথে রাতের বেলা বাড়ীতে দেখা করার কথা বলেছিলেন। প্রোফেসরের কথামতই ঋতিকা এখন বিশাল বিশাল গাছপালা ঘেরা বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

রাত প্রায় আটটা বাজে। অন্ধকারে ঝুপসি হয়ে আছে গাছপালা। বাড়িটাতেও কোন আলো জ্বলছে না। ঋতিকা ল্যাব থেকে বেরোবার আগে মেসেজ করেছিল প্রোফেসরকে। এখন একটা ফোনও করল। ফোনটা বেজে যাচ্ছে কেউ ধরছে না। অধৈর্য হয়ে ঋতিকা বাগানের গেটটায় হাত দিতেই সেটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে ঋতিকা ছোট টর্চটা জ্বালিয়ে দরজার আশে পাশে কলিংবেল খুঁজল। না পেয়ে দরজায় টোকা দিল আর জোরে ডাকল "প্রোফেসর? প্রোফেসর?"। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও কারোর সাড়া না পেয়ে সে এবার দরজার কড়া ধরে জোড়ে জোড়ে নাড়া দিল। ঋতিকার হাতের ধাক্কায় দরজার পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুলে গেল। ঋতিকা খুব অবাক হল। এ আবার কি? বাগানের গেট খোলা। সদর দরজা খোলা। ঋতিকা পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল। ঘরের ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। ঋতিকা গলা তুলে দুবার ডাকল, "প্রোফেসর আছেন?"

ঋতিকা টর্চের স্বল্প আলোয় হাতড়ে হাতড়ে লাইটটা খুঁজছিল দেওয়ালে। পেয়েও গেল। পর পর সুইচগুলো জ্বেলে দিতেই ঘর আলোকিত হয়ে উঠল।

আকস্মিক আলোর বন্যায় ঋতিকার চোখে ধাঁধা লেগে গেছিল। ধোঁয়াশা ভাবটা কাটলে ঋতিকা অবাক হয়ে দেখল কারা যেন ঘর জুড়ে তান্ডব করে গেছে। আলমারীর অধিকাংশ বই মাটিতে পড়ে আছে। বেশ কিছু বইয়ের পাতা ছেঁড়া। একমাত্র পড়ার টেবিলটা তছনছ হয়ে আছে। একটা কম্পিউটার মাটিতে আছড়ে ভাঙ্গা হয়েছে। ভাঙ্গা কম্পিউটারটার পাশ দিয়ে ঘুরে টেবিলের পিছনে উঁকি দিতেই ঋতিকা চমকে উঠল। মেঝেতে একটা সোনালী রঙের কুকুর শুয়ে আছে চাপ চাপ রক্তের মধ্যে। মাথাটা ঘুরে গেল ঋতিকার। কোনমতে টেবিলের কোন আঁকড়ে নিজেকে সামলালো সে। "এক্ষুনি এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে" কে যেন ঋতিকার মাথার মধ্যে জানান দিল, "কেউ দেখে ফেলার আগেই"। ঋতিকা ফেরার চেষ্টা করল। কিন্তু কে যেন তাকে আটকে দিয়েছে। ভেতরের ঘরের দিকে এক দূর্নিবার আকর্ষনে সে একরকম টলতে টলতে এগোল দরজার দিকে। ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে ঋতিকার মাথাটা ঘুরে গেল। আধো অন্ধকারে মেঝের উপরে হাত পা ছড়িয়ে উপুর হয়ে পড়ে আছেন গোপালাচারী। ঋতিকার টর্চের আলোতে তার ঘাড়ের কাছে বিঁধে থাকা ছোট রূপালী তীরটা ঝিকিয়ে উঠল।

"হ্যালো, হ্যালো। হ্যালো চক্রেশ। শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ আমি, আমি ঋতিকা বলছি। চক্রেশ আমি মারাত্মক বিপদে পড়েছি। প্লিজ হেল্প মি।" ভয়ে ঋতিকার গলা কাঁপছে। গোপালাচারীর বডির পাশেই থেবড়ে বসে সে কাঁপা কাঁপা হাতে ফোন করেছে চক্রেশকে। এই বিপদে কাকে খবর দেবে না ভেবে পেয়ে শেষমেশ চক্রেশকেই ফোন করে বসল ঋতিকা। "তুমি একবার আসতে পারবে?... না কলকাতা নয়, খড়গপুর... হ্যাঁ হ্যাঁ... কতক্ষন লাগবে তোমার?... ওহ তুমি খড়গপুরেই আছো?... থ্যাঙ্ক গড... এক্ষুনি চলে এসো।"

চক্রেশ শান্ত মাথায় প্রশ্ন করে করে ঋতিকার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা জানল। তারপর ঋতিকাকে বলল, এক্ষুনি কোন একটা হাসপাতালে ফোন করতে। ঋতিকা জানাল যে সে হাসপাতালে ফোন করার পরেই চক্রেশকে ফোন করছে। হাসপাতালে ফোন করার পরেই তার মনে হয়েছে যে গোপালাচারী আর বেঁচে নেই। আর এই অবস্থায় পুলিশ তাকেই তো খুনের দায়ে ধরবে। ভয়ে আতঙ্কে ঋতিকা কেঁদে ফেলল। চক্রেশ কোনরকমে ঋতিকাকে আশ্বস্ত করে বাড়ীর ঠিকানাটা জেনে ফোন রাখল। তারপর দ্রুত হাতে কয়েকটা ফোন করল। তারপর স্টেশন থেকে বেরিয়ে অটো ধরল গোপালাচারীর বাড়ি যাওয়ার জন্য।

সেদিন চক্রেশ এত তৎপরতার সাথে আর ঠান্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা সামলেছিল যে ঋতিকার ইচ্ছা করছিল সবার মাঝে ওকে জড়িয়ে ধরে। সেদিন চক্রেশকে ফোন করার আধঘন্টার মধ্যেই চক্রেশ চলে এসেছিল গোপালাচারীর বাড়িতে। ততক্ষনে বাড়ী অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়িতে ছয়লাপ। চক্রেশ এসেই প্রথমে পুলিশ অফিসারের সাথে কি সব কথা বলল, তারপর শুধুমাত্র ঘটনাবলী সম্পর্কে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করেই পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। চক্রেশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ঋতিকার মনটা নরম হয়ে আছে। যদিও পুলিশ তাকে শহর ছেড়ে যেতে বারন করেছে। কিন্তু সে যেমন ভেবেছিল যে গোপালাচারীর বাড়ী থেকেই তাকে সোজা হাজতে ঢুকতে হবে তেমনটা কিছুই ঘটেনি।

দু'দিন পরে ঋতিকা ল্যাপটপটা চালু করল। প্রোফেসরের মৃত্যুর শকটা তার এখনো কাটেনি। চক্রেশ ঋতিকার জন্য খড়গপুরেই রয়ে গেছে। পুলিশ দুই দিনই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এসেছিল।

"দেখুন তো ফোটোতে। এই ডানদিকের ছেলেটাকে আপনি চেনেন কিনা?"

"হ্যাঁ চিনি।"

"কি নাম ছেলেটার?"

"নাম! আমি শুধু একবারই দেখেছি প্রোফেসরের বাড়ীতে। নাম জানিনা।"

"হুঁ। কবে দেখেছেন?"

"প্রোফেসর বিদেশ যাওয়ার আগে। প্রায় আট নয় মাস হবে। কলকাতার বাড়ীতে আমি আর প্রোফেসর কথা বলছিলাম তখন ছেলেটা প্রোফেসরের কাছে এসেছিল।"

"রিসেন্টলি দেখেননি?"

"রিসেন্টলি?"

"এই এক দুই সপ্তাহের মধ্যে?"

"না তো।"

"আমরা খবর পেয়েছি যে এই ছেলেটা আর আরেকটা বাচ্চা ছেলেকে প্রায় দিন দশেক আগে থেকে প্রোফেসরের বাড়ীতে দেখা যাচ্ছিল। কালকে সকালেও ছেলে দুটোকে অন্যেরা দেখেছে। কিন্তু রাত্তির থেকে তাদের আর কোন পাত্তা নেই।"

"আমি বলতে পারব না। গত পনেরো দিনের উপর আমি প্রোফেসরের কাছে যাইনি। আমার একটা পেপার বেরিয়েছে আমি সেটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।"

"প্রোফেসরের সাথে এই কয়েকদিন আপনার কথাও হয়নি?"

"না কথা হয়েছে। এমনকি প্রোফেসর আমাকে এও বলেছিলেন যে আগেরমত এবারেও তিনি কোন একটা পাহাড়ে বেড়াতে যাবেন। কোথায় যাবেন সেটাও আমাকে বলেননি আর কেউ যে এসেছে তাঁর বাড়ীতে সেটাও কিছু বলেননি।"

"আচ্ছা আপনি যখন একে প্রোফেসরের সাথে দেখেছিলেন তখন কি প্রোফেসরের মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন?"

"না সেরকমতো কিছু দেখিনি। বরং প্রোফেসর বেশ হাসিমুখেই কথা বলেছিলেন তখন।"

"কোন বাচ্চা ছেলেকে কি আপনি দেখেছিলেন তখন?"

"না। তা তো মনে পড়ছে না।"

"দেখুন মিস প্যাটেল আপনি যে পুরো সত্য কথা বলেছেন না তা আমি দিব্বি বুঝতে পারছি। সে যাই হোক আমি আবার আসব। এর মধ্যে ঠিক করে নিন আপনি পরেরবার কোন কোন কথাগুলো আমাদের জানাবেন।" পুলিশ অফিসারটি যেতে গিয়েও ফিরে এল, "আচ্ছা আরেকটা কথা আপনি কি জানেন ছবির ছেলেটি কেন প্রোফেসরের কাছে এসেছিল?"

ঋতিকা ঘাড় নাড়ল। সে জানে না।

"এর নাম রুদ্রশংকর। বেশ জমকালো নাম কি বলেন?" অফিসার গোঁফের আড়ালে মুচকি হাসল। "ইনি কলকাতার একজন নামকরা মাউন্টেনিয়ার। প্রোফেসর এদের দলের সাথেই গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পাহাড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ বছর এদের দল কোথাও যাচ্ছে না। আর রুদ্রশংকরেরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা চলি।" অফিসারটা চলে যেতে ঋতিকা নিজের ঘরে খাটে এসে বসল। এই সেই ছেলেটা যে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ভূমিকম্পের দিন ঋতিকাকে বাঁচিয়েছিল। সে খুনি? ঋতিকার মনে হচ্ছিল সব হিসেব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

দুই দিন ধরে ভেবে ভেবে মনস্থির করতে পারেনি ঋতিকা। তাই আজকে ঋতিকা কাজে মন দেবে বলে গুছিয়ে বসেছে। কিন্তু একটা অস্বস্তি ঋতিকাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। কাজে মন বসাতে না পেরে সে ইন্টারনেটটা খুলল। একটা অজানা মেইল এসেছে।

হাই ঋতিকা,

প্রোফেসর আমাকে তোমার কথা বলে গেছেন। তুমিই নাকি ওনার কাজ শেষ করবে। এই কাজের উপর নির্ভর করছে তোমার দেশের ভবিষ্যৎ। কলকাতায় যে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল তার

থেকেও বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করে আছে ভারতের জন্য। তুমি যদি প্রোফেসরকে শ্রদ্ধা কর তাহলে নেপালে এসো। ভবিষ্যৎ বদলাও। নয়তো ভবিতব্যকে মেনে নাও।

ইতি

তোমার পরিত্রাতা।

ঋতিকা সাথে সাথে ফোন করল চক্রেশকে। "হ্যালো চক্রেশ, আমি ঋতিকা। আমি একটা অদ্ভুত মেইল পেয়েছি... না কেউ আমাকে থ্রেট করেনি... হ্যাঁ, আমি তোমায় মেইলটা পাঠাচ্ছি। তুমি পড়ে বল আমার কি করা উচিত।" -ঋতিকা মেইলটা ফরোওয়ার্ড করল চক্রেশকে।

একটু পরে চক্রেশ ফোন করল ঋতিকাকে। "হ্যাঁ ঋতিকা... হ্যাঁ পেয়েছি, পড়েওছি... তোমার পরিত্রাতা মানে?... না আমিও ঠিক বুঝলাম না।... তোমার কি ইচ্ছা?... হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো একজন বিজ্ঞানী হিসাবে তুমি তোমার কাজকে এড়িয়ে যেতে পারো না... প্রোফেসর তোমাকে যদি বলেই থাকেন তাহলে আমার মনে হয় নেপাল যাওয়াই উচিত। ... না না; তুমি একা নও, আমি যাব তোমার সাথে। হ্যাঁ আমি যাব, আমি একবার যে ভুল করেছি দ্বিতীয়বার আর তা করতে চাই না... ওকে আমি ব্যবস্থা করছি আমাদের যাওয়ার... তোমার জন্য পুলিশের কাছ থেকে পারমিশনও নিতে হবে... " আরো কিছুক্ষণ কথা বলে চক্রেশ ফোনটা রেখে দিল। তার এখন অনেক কাজ।

।। ছয়।।

পাক্কা এক সপ্তাহ বাদে চক্রেশ আর ঋতিকা নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে নামল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে দুজনে পূর্বনির্ধারিত হোটেলে গিয়ে উঠল। চক্রেশই সমস্ত ব্যবস্থাপনা করেছে। ফ্লাইটের টিকিট থেকে হোটেল সব কিছু বুক করা। দুজনের আলাদা আলাদা দুটো রুম, পাশাপাশি। ঋতিকার রুমটার বারান্দা থেকে পাহাড়ি সৌন্দর্য নজরে আসে। তবে ঋতিকার মানসিক অবস্থা কোনরকমেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মত নয়। কাঠমান্ডুতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চক্রেশ তাকে অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই ঋতিকার মন বুঝ মানছে না। তার খালি মনে হচ্ছে সে ফাঁদে পা দিয়েছে। তার আসা উচিত হয়নি।

নেপালে আসার প্রথম দিন ঋতিকা নিজেকে পুরো ঘরবন্দী করে রাখল। যে অজানা মেইল পাঠিয়েছিল সেই পরিত্রাতারও আর কোন সাড়া শব্দ নেই। হোটেলে ফ্রি ওয়াই ফাই। ঋতিকা প্রায় সারাক্ষনই গুগল মেইল খুলে রেখেছে। দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ শুনে ঋতিকা চমকে উঠল। সতর্ক গলায় প্রশ্ন করল, "কে?"

-"আমি চক্রেশ, দরজা খোল।" চক্রেশের গলায় আশ্বস্ত হয়ে ঋতিকা দরজা খুলে দিল।

-"তুমি কি সারাদিন হোটেলের মধ্যেই থাকবে নাকি? বেরোবে না? আরে কিছু না হোক কাঠমান্ডু শহরটাকে তো দেখাই যায়।"

-"ওরেবাবা।" ঋতিকা এক লাফে খাটের উপরে চড়ে বসল। "না না ওসব শহর টহর দেখে কোন লাভ নেই। আর বেরোনোরই বা কি দরকার। ঐ রুদ্রশংকর নিশ্চয়ই আবার মেইল পাঠাবে। আর মেইল পাঠালে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই দেখা করতে বলবে। তখন তুমি পুলিশ নিয়ে সেখানে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেল।"

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চক্রেশও খাটের এক পাশে বসল। "এইটা বুঝি তোমার প্ল্যান? আমার মনে হয় না লোকটা অতটা বোকা। লোকটা যদি মেইল পাঠায় আবারও তবে তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সাথে।"

ঋতিকা সজোরে ঘাড় নাড়ল, "কক্ষনো নয়। বাপরে আমাকে খুন করে ফেললে?"

-"সেরকম কিছু করতে চাইলে কিন্তু লোকটা হোটেলে এসেও সেই কাজটা করতে পারে ঋতু। আমার মনে হয় না তেমন কিছু করবে লোকটা। তেমন কিছু করতে চাইলে কলকাতা শহরটাই তার কাছে সেফ ছিল। তার জন্য তোমাকে সে এই ভিনপাহাড়ী দেশে ডেকে আনবে না।"

- "বলছ?" ঋতিকা একটু আশ্বস্ত হল। "তাহলে লোকটা নেপালে ডাকল কেন আমাদের?"

-"লোকটা যা বলেছে সেটাই বিশ্বাস করা যাক। ভারতকে বাঁচাতে। চলো এখন নিচে চল। খুব খিদে পেয়েছে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে পেটে কিছু দিতে হবে।"

একটু পরে দুজনে হোটেলের নিচের তলায় রেস্টুরেন্টে নেমে এল। ঋতিকার ভয় কাটানোর জন্য ঋতিকাকে একলা রেখে চক্রেশ মিনিট দুয়েকের জন্য হোটেলের বাইরে থেকে ঘুরেও এল। ঋতিকার ভয় অনেকটা কেটে গেছিল। পরের দিন ঘুরতে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ীও বুক করল দুজনে মিলে।

পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাস্টের জন্য চক্রেশ ঋতিকার দরজায় নক করল। বেশ কিছুক্ষণ নক করেও কোন উত্তর নেই দেখে ঋতিকার ফোনে ফোন করল। একবার দু বার তিনবার। ফোন ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে চক্রেশ বাইরে থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। এবার চক্রেশ ভয় পেল। সে দুড়দাড় করে ছুটে গেল হোটেলের রিসেপশনে। রিসেপশনের ছেলেটা খুব ভালো। তাকে ব্যাপারটা বলতেই সে একটা এক্সট্রা চাবি নিয়ে চক্রেশের সঙ্গে উপরে উঠে এল। ঋতিকার ঘরের দরজা খুলতে দেখা গেল যে ঘরে কেউ নেই। হাওয়ায় একটা মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। ঋতিকার জামাকাপড় মায় ল্যাপটপ কিচ্ছুই নেই। শুধু মোবাইল ফোনটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা। চক্রেশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তার কখনই উচিত হয়নি এতটা কেয়ারলেস হওয়া। অবস্থা বুঝে রিসেপশনের ছেলেটা গিয়ে ততক্ষনে ম্যানেজারকে ডেকে এনেছে। ম্যানেজার এসেও অবাক। তার এত বছরের হোটেলের চাকরি জীবনে সে কখনো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। তার হোটেল থেকে কখনো একটা ব্যাগ পর্যন্ত চুরি হয়নি আর এতো একটা গোটা মানুষ চুরি। এরকম একটা ঘটনা জানাজানি হলে অন্যান্য বোর্ডাররা যদি ঘর ছেড়ে দেয়, এই ভেবে ম্যানেজারটা এতই ভয় খেয়ে গেল যে সে কিছুতেই চক্রেশকে হোটেল থেকে পুলিশে ফোন করতে দিল না। শেষমেশ চক্রেশ একটা গাড়ী নিয়ে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে একটা ডায়রী লিখিয়ে এল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না তার কি করা উচিত। কলকাতায় যে পুলিশ অফিসারের সাথে তার চেনাশোনা আছে তাকে কি একবার ফোন করবে চক্রেশ! সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে মোবাইলটা নিয়ে দ্রুতহাতে নম্বর টিপতে শুরু করল।

তখন বেশ অন্ধকার চারিদিক। তবু তারমধ্যে কোথা থেকে যেন একটা আলোর সুতীক্ষ্ণ রশ্মি এসে চোখে বিঁধছে। কোথায় একটা ঘড় ঘড় শব্দ করে মেশিন চলছে। তার কম্পনটাও অনুভব করল ঋতিকা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। শরীরে মনে হচ্ছে একটুও জোর নেই। ঋতিকা নড়াচড়া না করে আরো কিছুক্ষণ এক ভাবে শুয়ে রইল। অন্যান্য অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেও ঋতিকা কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না। দুটো চোখ যেন আঠার মত জড়িয়ে আছে। একটা দরজা খোলার আওয়াজ পেল ঋতিকা। কাঠের মেঝেতে জুতো পায়ের খট খট আওয়াজ হচ্ছে। ঋতিকা কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। তারপরেই মুখের উপরে হিমঠান্ডা জলের তীব্র

স্পর্শ পেয়ে একেবারে ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। "উফফ, বাঁচালেন।" বলে কে যেন ধপ করে এসে খাটের উপর বসল। ঋতিকা আতঙ্কে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই মাথাটা ঘুরে গেল। অন্ধের মত সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে অবলম্বন খুঁজতে চাইল ঋতিকা। "আরে করেছেন কি? এমন করবেন না একদম। শুয়ে পড়ুন বলছি।"- বলে কে যেন ঋতিকার হাত চেপে ধরে আবার তাকে খাটের উপর শুইয়ে দিল। "একদম চুপটি করে শুয়ে থাকুন। আপনার প্রেশার আর পাল্‌সটা মাপতে হবে।" ভারী ব্যারিটোন গলাটা নরম করে বকল ঋতিকাকে। ঋতিকা কোথায় যেন শুনেছে গলাটা। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। সে দেখার চেষ্টা করল চোখ খুলে। কিন্তু কিছুতেই চোখ খুলতে পারল না। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ঋতিকা, "আমি, আমি কিছুতেই চোখ খুলতে পারছি না।" "পারবেন পারবেন।" ভারী কণ্ঠস্বর ঋতিকাকে আশ্বস্ত করল। একটু পরে ঋতিকা চোখের গোড়ায় দুটো শক্ত আঙ্গুলের স্পর্শ পেল। নাকের পাশে চোখের কোনায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল ঋতিকা। আঁ আঁ করে চেঁচিয়েও থেমে গেল সে। এবার তার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। একটু পরেই ঋতিকা চোখ খুলতে পারল। যদিও এখনো ঝাপসা দেখছে। সে দেখল একটা ছেলে দ্রুত হাতে তার ব্লাড প্রেসার আর পাল্‌স রেট মাপছে। কান থেকে স্টেথিস্কোপটা নামিয়ে ছেলেটা একগাল হাসল, "নাহ সব ঠিকঠাক, কোন অসুবিধা নেই। খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন যা হোক।" ঋতিকা চোখটা কচলে নিল একবার, সে কি ঠিক দেখছে। রুদ্রশংকরই তো। ভয় খাওয়া গলায় ঋতিকা জিজ্ঞেস করল, "ভয় খাইয়ে দিলাম কি রকম?"

"বাব্বা সেই কখন থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। দেড় দিন হয়ে গেল জ্ঞান ফেরেনা। ভয় পাব না আমি?"

"আপনি তো আমায় অজ্ঞান করে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছেন? এখন ভয় পাবার কথা বলছেন যে বড়?"

"না দেখুন অজ্ঞান করে নিয়ে এসেছি এটা ঠিক কথা। কিন্তু ঠিক কিডান্যাপ করিনি। আপনার বন্ধুকে একটা মেইল করে দিয়েছি আমি। যে একদম চিন্তা করবে না। কয়েকটা কাজ মিটে গেলেই কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

"আপনি একটা খুনি। একজন প্রোফেসরকে খুন করেছেন। আমাকে কিডন্যাপ করেছেন এখন আবার ভয় দেখাছেন যে কাজ করতে হবে। পুলিশ আপনাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। আর আপনার কোন কাজ আমি করব না।"- রাগে চেঁচিয়ে উঠল ঋতিকা।

"প্রফেসরের খুনের জন্য পুলিশ আমায় খুঁজছে আমি জানি।" – শান্ত স্বরে বলল রুদ্র শংকর, "কিন্তু আমি খুন করিনি। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আমি খুন করেছি? প্রোফেসরের সাথে আমার আজ পাঁচবছর ধরে বন্ধুত্ব।"

"তাহলে আপনি পুলিশকে সে কথা জানাচ্ছেন না কেন?"

"এখন যদি আমি পুলিশের কাছে ধরা দিতাম তাহলে পুলিশ আমাকে কলকাতার বাইরে বেরোতে দিত না কিছুতেই। অথচ আমার খুব প্রয়োজন এক জায়াগায় যাওয়ার। নয়ত যেকোন দিন ভারতবর্ষ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।"

"আপনি আমায় বোকা পাননি নিশ্চয়ই।"

"নাহ বোকা নয়। আপনাকে আমি একটা গল্প বলব। তারপর যদি আপনার আমাকে বিশ্বাস হয় তো আপনি কাজটা করে দেবেন। নয়তো আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব। কোনভাবেই আটকে রাখব না। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আপনি। তবে একদিন আমি আপনাকে প্রানে বাঁচিয়েছিলাম তার বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে আমি শুধু কিছু দক্ষতা আশা করছি।" রুদ্র ঋতিকার চোখে চোখ রাখল।

ঋতিকা অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল। সে খুব নরম স্বভাবের মেয়ে। হঠাৎ করে কিছু করে ফেলা তার স্বভাব নয়। এমনকি তার রুদ্রশংকরকে খুব একটা খারাপও লাগছে না। এটা তো ঠিকই আজ রুদ্রশংকর না থাকলে সে এই পৃথিবীতে চলে ফিরে বেড়াত না। ঋতিকা একবার চোরাচোখে দেখল রুদ্রশংকরকে। নাহ ছেলেটা মোটেও কোন গুণ্ডা বদমাইশের মত দেখতে নয় সে, বরং ঠিক তার উল্টো শান্ত ভদ্র ঝকঝকে বুদ্ধিমান একটা ছেলে। ঋতিকা ঠান্ডা স্বরে বলল, "তা কি গল্প?"

"গল্পের আগে আপনি কিছু খেয়ে নিন। অনেকক্ষন না খেয়ে আছেন।" এইবলে রুদ্রশংকর দরজার বাইরে গিয়ে কাকে যেন খাবারের কথা বলে এল। একটু পরে একটা ছেলে এল ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে, সে ন্যাড়ামুন্ডি আর পরনে হলুদ জামা গাঢ় লাল চাদর। ঋতিকাকে দেখে এক গাল হাসল। নিষ্পাপ হাসি। ঋতিকা অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। বুদ্ধের সাধক! লামা! একজন লামা রুদ্রশংকরের সাথে কি করছে? যদিও লামাদের সন্মন্ধে ঋতিকা বিশেষ কিছুই জানে না। লামা বালকের নিষ্পাপ হাসিটা দেখে রুদ্রশংকরের প্রতি ঋতিকার যেটুকু দ্বিধা ছিল তা কেটে গেল। এই বাচ্চা ছেলেটা যার সহকারী সে যাই হোক খুনী নয় অন্তত। ঋতিকা খেতে শুরু করল। খাওয়া হয়ে গেলে, রুদ্রশংকর কফি বানাল। কফি খেতে খেতে রুদ্রশংকর ঘটনাটা খুলে বলল ঋতিকাকে। কাঞ্চেন লামার চিঠি থেকে শুরু করে পেমার ভারতে আগমন। তারপরে ভূমিকম্প, সোলার ফ্লেয়ার, অদ্ভুত যন্ত্র, এমনকি প্রোফেসরের তিব্বতে যাওয়ার ইচ্ছার কথাও রুদ্র বাদ দিল না।

ঋতিকা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। এ যেন সত্যি এক গল্পের মত। কথা শেষ করে রুদ্র এক চুমুকে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া কফিটা গলাধঃকরন করল, "এবার আপনি বলুন আপনি কি চান? প্রোফেসর কাজটা শেষ করতে পারেননি। উনি বলেছিলেন আর দিনদুয়েকের কাজ বাকি আছে। কিন্তু কিছু একটা কারনে উনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই আমাদের যা প্ল্যান ছিল তা বদলে দুই সপ্তাহ আগেই প্লেনের টিকিট কেটে ছিলেন। অত তাড়াতাড়ি তিনজনের টিকিট পাওয়া যায়নি তাই প্রোফেসর আমাদের হাত দিয়েই জিনিসটা পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজের জন্য দুইদিন বাদের আরেকটা টিকিট কেটে রাখলেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রোফেসর বুঝতে পেরেছিল যে তার পিছনে লোক লেগেছে। তাই তিনি তড়িঘড়ি জিনিসটা নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।"

কথা ক'টা বলে রুদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সে কিছু একটা ভাবছে। ঋতিকা নিচু গলায় বলল, "প্রোফেসর আমাকেও আভাস দিয়েছিলেন। আমি তখন বুঝিনি। আমি কাজটা শেষ করব। আপনি ভাববেন না।"

"তাহলে চলুন আপনাকে জিনিসগুলো দেখাই। আপনি রাজী থাকলে কাজ শুরু করে দিন, কারন আমাদের হাতে বেশীদিন সময় নেই।" রুদ্র ঋতিকাকে নিয়ে ঘরের বাইরে এল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঋতিকাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। একটা লম্বা করিডোর যার এক পাশে দূরে চৌকো দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। কেউ একজন দরজা খুলে রেখেছে। রুদ্র ঋতিকাকে নিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। ঋতিকা পিছন ফিরে দেখল একজন লামা এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঠান্ডা হাওয়াটা একটু কমল। করিডোরটা একটা বাঁক নিতেই ঋতিকা আবার দুটো বাচ্চা লামা ছেলেকে দেখতে পেল। তারা গল্প করতে করতে হাসতে হাসতে করিডোর ধরে আসছে। ঋতিকা আর কৌতুহল দমন করতে পারল না, "আমরা কোথায় আছি এখন?"

"এই জায়গাটার নাম ততপানি।"

"এটা কি গুম্পা?"

"হ্যাঁ এটা একটা ছোট গুম্পা। লামারা আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে এই ব্যাপারে?"

"কেন?"

রুদ্র ফিরে দেখল ঋতিকাকে, তারপর হাত দিয়ে ঠেলে একটা ঘরের দরজা খুলল। "আপনার ল্যাবরেটরি। আসুন।" রুদ্র যে ওর কথাটা এড়িয়ে গেল তা বুঝতে পারল ঋতিকা। ঘরটায় বিশেষ কিছু নেই। একটা বিশাল বড় টেবিল। তার একপাশে একটা ল্যাপটপ। অন্য পাশে কিছু প্যাকিং বাক্স। প্যাকিং বাক্স থেকে সার্কিটগুলো বের করে রুদ্র সাবধানে সাজিয়ে রাখতে লাগল সেগুলো। আর ঋতিকাকে এগিয়ে দিল এক তাড়া কাগজের বান্ডিল।

ঘন্টাখানেক ধরে কাগজের বান্ডিল আর ল্যাপটপে লিখে রাখা গোপালাচারীর লেখাপত্র হাঁটকে ঋতিকা মুখ তুলে দেখল রুদ্রশংকর কখন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। সে উঠে গিয়ে দরজায় হাত দিল। দরজাটা খোলাই আছে। একবার বেরিয়ে দেখবে নাকি? ইচ্ছাটা প্রবল হওয়াতে দরজা খুলে বাইরে বেরনোর উদ্যোগ করেই থেমে গেল ঋতিকা। একটা বড়সড় চেহারার ভুটানি লোমশ কুকুর বসে আছে। সে এক পা বাইরে রাখতেই কুকুরটা দাঁত খিঁচিয়ে গরগর শব্দ করতে লাগল। অবস্থা দেখে ঋতিকা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সার্কিটগুলো নিয়ে কাজ করতে করতে কতটা সময় কেটে গেছে ঋতিকা জানেনা। একটা কাজ শেষ হওয়ার পর মুখ তুলতেই সে রুদ্রকে দেখতে পেল। চোখে চোখ পড়তে রুদ্র হেসে উঠল। "নাহ আপনারাই বিজ্ঞানী হবেন। আমি দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম। চেয়ারে বসলাম কিছুই আপনার চোখে পড়ল না।"

"কতক্ষন এসেছেন?"

"হবে আধা ঘন্টা। আপনি কাজ করছেন দেখে আর বিরক্ত করিনি। কি বুঝছেন? বানানো যাবে যন্ত্রটা?"

"হ্যাঁ যাবে। দিন দুয়েক সময় লাগবে। প্রোফেসর সমস্তটা বানিয়েই ফেলেছেন প্রায় শুধু খান দশেকের মত কাজ বাকি।" একটু চুপ করে থেকে ঋতিকা বলল, "আমি শুনেছি তিব্বতের বর্ডারে প্রচুর কড়াকড়ি। আপনি এই পার্টসগুলো নিয়ে কিভাবে যাবেন ভেবেছেন?"

"প্রোফেসর একটা বক্স বানিয়েছিল। আমরা তো ওটা করে নিয়ে চলে এলাম নেপালে। কাস্টমসে তো ধরতে পারেনি। আশা করছি ওটা করেই নিয়ে যাওয়া যাবে। আর পার্টসগুলো খুবই ছোট ছোট তাই না?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা এই পার্টসগুলো কি কাজে লাগবে তা কি আপনি জানেন?"

রুদ্রশংকর ঘাড় নাড়ল সে জানে না। তবে সে কিছু একটা আন্দাজ করতে পারে। সেটা কি জিজ্ঞেস করতে রুদ্রশংকর ইলেক্ট্রিক স্টর্ম আর মানস সরোবরের আশেপাশের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলল। রুদ্র মনে করে যে ঐ অঞ্চলে এমন একটা যন্ত্র আছে যেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। সেই যন্ত্রটা ঠিক করে সারিয়ে তোলার জন্যই প্রফেসরের এই কাজ।

"মানস সরোবরের ওখানে? কি এমন যন্ত্র?"

"আমি জানি না। প্রোফেসর আমায় খুলে কিছুই বলেন নি। উনি আমার সাথে কাঠমান্ডুতেই দেখা করবেন বলেছিলেন। তারপরে আমরা সেখান থেকে মানস সরোবরের পথ ধরব। কিন্তু পরে প্রোফেসর আমাকে একটা মেইল করেছেন, তাতে করে উনি আমায় দারচেন গুম্ফায় যেতে বলেছেন। সেখানে গিয়ে কোন একজন লামার সাথে আমায় দেখা করতে হবে। তার নাম কাঞ্চেন।"

"তাহলেই আপনার কাজ শেষ?"

"সেরকমই তো মনে হচ্ছে। তবে প্রোফেসর থাকলে আমরা অবশ্যই একবার কৈলাস পরিক্রমা করতাম আর আমার তো ইচ্ছাই ছিল কৈলাসের সপ্তঋষি গুহা পর্যন্ত ওঠার। এখন কিছুই বুঝতে পারছি না কি হবে।"

"আপনি মাউন্টেনিয়ার?"

"হ্যাঁ। আমরা হিমালয়ের অনেকগুলো শৃঙ্গেই এক্সপিডিশন করেছি গত কয়েক বছরে।"

"তা কৈলাসের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করতেন না? সপ্তঋষি গুহা কেন?"

"না গুহা অবধি ওঠা যায়। কৈলাসের চূড়ায় কাউকেই উঠতে দেয় না।"

"সে কি? কেন? খুব কঠিন রাস্তা বুঝি? অনেক উঁচু?"

"না না। কৈলাসের উচ্চতা এই ছয়হাজার সাতশো মিটারের মত। এর থেকে অনেক উঁচু উচু পিক আছে হিমালয়ে। এমন কিছু উচ্চতা নয়। কিন্তু উঠতে দেওয়া হয় না ধর্মীয় কারনে। বলা হয় একমাত্র যে কোন পাপ করেনি জন্ম থেকে সেই উঠতে পারবে উপরে। সে যাই হোক ওটা একটা ধর্মীয় জায়গা, তাই চিনারা আর কাউকে অনুমতি দেয় না ওঠার।"

"কেউ কোনদিন ওঠেনি?"

"সেই রকমই তো জানি। দুয়েকবার কয়েকজন মাউন্টেনিয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একজন সময়ের অভাবে ফিরে যান, আরেকজনকে ধর্মীয় কারনে সাধারন তিব্বতীরা বাধা দেওয়ায়, চীনারা অনুমতি দেওয়া বন্ধ করে দেয়।"

"একজনই শুধু উঠতে পেরেছিলেন।" একটা ভাঙ্গা গলা শুনে দুজনে দরজার দিকে তাকাল। পেমা দোরজে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। রুদ্রর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

।। সাত।।

- "স্যর, মিস ঋতিকাকে রুদ্রশংকর কিডন্যাপ করেছে।"
- "যাক তাহলে সব ঠিকঠাক এগোচ্ছে। রুদ্রশংকর নিশ্চিত কৈলাসের দিকে যাবে। তুমি সব ব্যবস্থাপনা করে রাখো।"
- "স্যর হঠাৎ কৈলাস কেন? রুদ্রশংকর কি ডিভাইসটা চীনের সরকারের কাছে পাচার করবে?"
- "মূর্খ। তাই যদি হত তাহলে অনেকআগেই আমরা রুদ্রশংকরের কাছ থেকে ওটা পেয়ে যেতাম। ও ডিভাইসটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। ছেলেটার বড্ড জেদ।"
- "কিন্তু স্যর এই ডিভাইসটা নিয়ে রুদ্রশংকরই বা কি করবে?"
- "আমার মনে হয় ওই ডিভাইসের আরো কিছু অংশ কৈলাসে গোপালাচারীর দলের লোকদের কাছে আছে। রুদ্রশংকর এই অংশটা তাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে।"
- "তাহলে কি আমরা এখন রুদ্রশংকরের উপর হামলা করে ডিভাইসটা কেড়ে নেব?"
- "না। আমি পুরো যন্ত্রটা দেখতে চাই। তুমি রুদ্রশংকরের উপর নজর রাখবে। দেখবে যাতে করে ও নির্বিঘ্নে নেপালের বর্ডার পেরোতে পারে। আর তুমিও যাবে কৈলাস অবধি। মনে হয় রুদ্রশংকর গাড়িতে যাবে। তুমিও গাড়ি বুক করার চেষ্টা কর।"
- "ওকে স্যর। আর আপনি?"
- "আমি তোমার সাথে মানস সরোবরের পাশে চিউ গুম্ফায় দেখা করব। আমি কপ্টারে যাব।"

পেমা সত্যি কাজের ছেলে। সে কি কারসাজী করেছে রুদ্র জানেনা। কিন্তু ঐ সমস্ত জিনিসপত্র আর রুদ্রকে পেমা শুধ্রমাত্র আর দশটা গাড়ীর মতই ভিসা আর পাসপোর্ট জোরেই বের করে দিল। রুদ্র আর পেমা একদল লামার সাথে একটা গাড়ীতে যাচ্ছে। এরা সবাই তীব্বতের বিভিন্ন মনাস্ট্রিতে যাবে। সবাই বেশ অভিজাত লামা। কয়েকজন অল্পসল্প ইংরাজীও জানে। কিছুদিন আগে দলাই লামা কাঠমান্ডুতে এসেছিলেন। তিব্বতের

বিভিন্ন জায়গা থেকে উঁচুস্তরের লামারা তার সাথে এসেছিলেন। তারাই এখন ফেরত যাচ্ছে যে যার গুম্ফায়। পেমা যে কোন জাদুবলে তাদের মধ্যে জায়গা করে নিল তা রুদ্র জানেনা।

নেপাল-চায়না বন্ধসেতু আর ঝাংমু এই দুই জায়গাতেই ইমিগ্রেশন পরীক্ষা হয়। ততপানির পর থেকেই রুদ্র একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে বসেছিল। নেপাল চায়না বন্ধুসেতু-তে তাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। রুদ্র ধরেই নিয়েছিল এখান থেকেই তাকে সোজা জেলে আর তারপর ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তাকে আটকে রেখেছে দেখে দু তিনজন লামাকে নিয়ে পেমা একবারে অফিসের ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানে তারা কি কথা বলল জানা নেই, তবে তারপরেই তাকে ছেড়ে দেয় ওরা। এর আধঘন্টা পরে ঝাংমু। সেখানে অবশ্য বেশি সমস্যা পোহাতে হয়নি। এখানে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে রুদ্র দুপুরের খাওয়ার খেয়েছে আর তার সাথে গাড়ীর ড্রাইভার শেরপা শিন লিং। লামারা বোধহয় সাম্পা আর চা ছাড়া কিছুই খায় না। ঝাংমু অত্যন্ত ছোট ঘিঞ্জি এলাকা। তবে শহরের মোটামুটি সমস্ত সুবিধাই এখানে পাওয়া যায়।

এখন ন্যালমের পথে গাড়ী চলছে। ন্যালমে তারা রাত্রিবাস করবে। পরের দিন ন্যালম থেকে কয়েকজন লামা চলে যাবে লাসার দিকে। আর কয়েকজন যাবে কৈলাস মানস সরোবর। অনেকক্ষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকলে মাথা ভার হয়ে আসে। ঘুম পায়। রুদ্ররও তাই হচ্ছিল। গোপালাচারীর তৈরী সার্কিটের বাক্সটা কোথায় রেখেছে পেমাই জানে। ওটা কাঞ্চেন লামার হাতে তুলে দিতে পারলেই তার ছুটি।

ঋতিকা ভালো বিজ্ঞানী হবে। গোপালাচারীর লিখে যাওয়া সুত্রগুলো ধরে সে চারদিনের মধ্যেই বানিয়ে দিল যন্ত্রাংশগুলো। জিনিসগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ওটা কোন একটা বড় যন্ত্রের একটা অংশ বিশেষ। ঋতিকা বার বার করে তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু তখন রুদ্রর নিজেরই তিব্বতে ঢোকার কোন ঠিক ছিল না। তাই কাঠামান্ডুগামী বাসে ঋতিকাকে তুলে দিতে সে বাধ্য হয়। ঋতিকা তার থিসিসের জিনিস পেয়ে গেছে। সে যেন সুস্থভাবে কলকাতা ফিরে যেতে পারে। আসার আগে সয়ম্ভুনাথের মন্দির পূজো দিয়েছে রুদ্র।

ন্যালম থেকে গাড়ী ছেড়েছে খুব ভোরে। আগের রাত্রে রুদ্র প্রায় মড়ার মত ঘুমিয়েছে। আজ তারা যাবে মানস সরোবরের সব চেয়ে নিকটবর্তী শেষ গ্রাম পারায়াং-এ। ন্যালাম থেকে পায়াংঝেন ঝোংবা বা পারায়াং দোংবা প্রায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার, আর মানস সরোবর সাতশো কিলোমিটারেরও বেশী। যদিও টুরিস্ট গাড়ীগুলো পথে সাগার মত কোন একটা তীব্বতি গ্রামে রাত কাটায়। কিন্তু রুদ্রদের গাড়ী ওইসব জায়গায় থামবে না। রাস্তা খুবই ভালো। এত টুরিস্ট আজকাল মানস সরোবর দেখতে আসে যে একেবারে ঝকঝকে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে চীন সরকার তাদের জন্য। কিছু কিছু পাহাড়ি রাস্তা একটু আধটু খারাপ। কিন্তু ভারতে এর থেকে ঢের ঢের খারাপ পাহাড়ী রাস্তায় চড়তে অভ্যস্ত রুদ্র। সব কিছু ঠিক ঠাক চললে সন্ধে নাগাদ তারা পৌঁছে যাবে পায়াংঝেনে। রুদ্র চেয়েছিল আজকেই মানস সরোবর চলে যেতে সোজা। কিন্তু শিন লিং জানাল যে রাত্রিবেলা গাড়ী চালানো তিব্বতে একদম নিষেধ। যদিও রাস্তা এমন কিছু ভয়ংকর নয়। তবুও তিব্বতী গ্রামগুলো এতোটাই দুরে দুরে যে রাতবিরেতে মাঝখানে কোন ঘটনা ঘটলে খবর পাঠানো খুবই মুশকিল। আর সবথেকে বড় কথা রাস্তায় কোথাও বৈদ্যুতিক আলো নেই। তাই অন্ধকারের মধ্যে শুধু হেডলাইট ভরসা করে এত কিলোমিটার যাওয়াটা বেশ বিপদজনক।

মানস সরোবরের তীরে এখন তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য পাকা বাড়ী তৈরি করে দিয়েছে চায়না সরকার। এছাড়াও দারচেন গুম্ফায় গেস্টহাউস আছে বিশাল। তবে গত ভূমিকম্পে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে সেই সব বাড়ীর। সেইসব আগুপিছু ভেবেই রুদ্র একটা দুজনের তাঁবু, একটা স্লিপিংব্যাগ, ম্যাট্রেস আর আনুসাঙ্গিক কিছু

পাহাড়ে চড়ার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। তবে মানস সরোবরের তীরে তারা রাত কাটাবে না। গাড়ী তাদের পৌঁছে দেবে দারচেন গুম্ফায়। সেইখানে কাঞ্চেন লামা থাকেন।

ন্যালমও শহরের দোষগুণে ভরপুর। তার থেকে কিছুদূরেই আছে বিখ্যাত উড়ন্ত লামার গুহা। সেখানে নেমে লামারা কিসব পূজো টুজো করলেন। এই লামার কথাই দিনদুয়েক আগে ততপানিতে বসে পেমা বলছিল। মাত্র দুদিন কেটেছে অথচ সত্যের মনে হচ্ছে সে যেন কতযুগ আগে ওই দিনগুলোকে পিছে ফেলে এসেছে। সেদিন পেমা বলেছিল একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত লামা মহাযোগী মিরালেপার কথা। মিরালেপাই নাকি একমাত্র লামা যিনি ঐ পর্বতের মাথায় উঠেছিলেন। তাও আবার বেয়ে বেয়ে নয়, একেবারে উড়ে।

ন্যালম ছাড়াবার পর রুদ্র মনে হল সে যেন আস্তে আস্তে আসল তীব্বতে ঢুকছে। যতদূর চোখ যায় রুক্ষ ধূসর পাথরের দিগন্ত বিস্তৃত ন্যাড়া মরুভূমি। কোন বড় গাছপালা নেই, ফুল নেই, পাখি নেই, এমনকি একটা প্রজাপতিও চোখে পড়ল না রুদ্রর। ছোট বড় থ্যাবড়া ছুঁচলো গোল লম্বাটে বিভিন্ন প্রকার পাথরের রাজত্ব মাঝে মাঝেই। মাঝারি আকৃতির প্রচুর পাহাড় চতুর্দিকে। কিছু দূরের পাহাড়ের মাথায় বরফ।

একটু পরেই দৃশ্যটা বদলে গেল। ন্যাড়া মরুভূমি ছেয়ে আছে ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ আর ঘাস। দূর থেকে সবুজ মাঠগুলোকে আমাদের বাংলার শস্যশ্যামল মাঠের মতই লাগছে। শুধু এই সবুজের রঙ একটু অন্যরকম। শস্যশ্যাওলা বলা যেতে পারে এই দিগন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে। কিছু কিছু জায়গায় জল জমে আছে। রুক্ষ ধূসর পথের মাঝে মাঝে এই নীলচে সবুজ আভা চোখকে শান্তি দেয়। ন্যালমের পর থেকে রুদ্র আর বড় গাছ বলে কিছুই দেখতে পায়নি। তার বদলে মাঠের সবুজ ভেদ করে কদাচিৎ মাথা তুলে আছে সাদা বা রংবেরঙের তাঁবু। ওগুলো নাকি রাখালদের থাকার জায়গা। রাখালই বটে। কোথাও কোথাও একশ দেড়শ অবধি ইয়াক বা ভেড়ার দল চড়ে বেড়াচ্ছে এমনো রুদ্র দেখতে পাচ্ছে। এই ইয়াক বা ভেড়ার দলকে ঘাস খাওয়াবার জন্য কিছু কিছু লোক এদের চড়িয়ে চড়িয়ে দূর দূর প্রান্তে নিয়ে যায় গরমের সময়। এ যেন সেই প্রাচীন কালের মানব সভ্যতা। পশুদের নিয়ে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ানো। এক তৃনভূমি খালি হলে চলে যাওয়া অন্য তৃণভূমিতে। কিছু কিছু সমতল জায়গায় যেখানে সরু নালার মত নদী বয়ে গেছে বা বরফগলা জল জমে আছে সেখানে চাষ আবাদের চেষ্টা চলছে, কিন্তু সে খুবই কম।

সাগা নামক একটা ছোট তিব্বতী গ্রামে রাত্রিবাস করতে হল। এই জায়গাটার চারধারেই পাহাড়। এটা একটা ছোট উপত্যকার মত। পাহাড়গুলোর মাঝখান দিয়ে নদীর মত কালো পিচের রাস্তা বয়ে গেছে। সেই রাস্তায় দীর্ঘ লম্বা সব ফাটল। গত ভূমিকম্পের চিহ্ন রেখেছে প্রকৃতি। এই গ্রামটা পেরোনর পরেই রাস্তা একজায়গায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বোল্ডার পড়ে। মিলিটারি তৎপরতায় সেইসব জায়গা খানিকটা ঠিক হয়েছে। এইখানেও অনেক হোটেল। কিন্তু বেশীরভাগই ভূমিকম্পের চিহ্ন বহন করছে। উপত্যকাটা ছোট বলে হোটেলগুলো একেবারে পাহাড়ের কোলের কাছে অবস্থিত। সেইজন্য ক্ষতিও হয়েছে বেশিমাত্রায়। তবে দোতলার থেকে উঁচু বাড়ী দেখতে পেল না রুদ্র। পেট্রল পাম্প, রেস্টুরেন্ট, ফোনবুথ কি নেই ছোট্ট তীব্বতী গ্রামটায়।

এতক্ষন তাও কিছু সবুজের আভা ছিল ধূসরের মধ্যে, কিন্তু সাগা পার হওয়ার পর তাও যেন মুছে গেল। ন্যাড়া ধূসর ধূলিময় রাস্তা শুরু হল আবার। মাথার উপর শরতের তকতকে নীল আকাশ আর সাদা মেঘের আনাগোনা। একঘেয়ে প্রকৃতি দেখতে দেখতে চোখ টন টন করে। জিপের সবাই প্রায় ঢুলছে। একজন লামা ঘুমাতে ঘুমাতেও জপ করছে। রুদ্র স্পষ্ট তার নাক ডাকা শুনতে পাচ্ছে, আবার তার ছোট জপযন্ত্রটাও ঘুরতে

দেখছে। আজীবনকাল জপ করতে করতে এটাই বোধহয় লামাদের অভ্যাস হয়ে যায়। রুদ্র সামনের দিকে মুখ ফেরাল। পেমাও ঘুমাচ্ছে। একমাত্র সে আর ড্রাইভার জেগে। রাস্তা খুবই মসৃন। এতটুকু ঝাঁকুনি পর্যন্ত নেই। তবে ভূমিকম্পের জন্য বেশ কিছু জায়গায় রাস্তায় বড় বড় লম্বা ফাটল তৈরী হয়েছে। ড্রাইভার কাম গাইড কাম শেরপা শিন লিং অনেক গল্প করতে চাইছে রুদ্রর সাথে, কিন্তু ভাষাটা বেশ বাধার সৃষ্টি করছে। তবুও শিন লিং ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে তার কথা চালিয়ে যাচ্ছে। মৌসুমী বায়ুর প্রসাদ থেকে তীব্বত বঞ্চিত। তাই বছরের নয় মাসই শুকনো খটখটে। আর রাশিয়া থেকে আসা তীব্র হিমেল হাওয়ার কল্যানে এখানে তুষারপাতটাও ভালোই হয়। এই তুষারপাত আর উঁচু উঁচু পাহাড়ের গ্লেসিয়ারেগুলোর কল্যানে যা জল পাওয়া যায়। ছ সাতটা বড় বড় নদী এই দেশটার গ্লেসিয়ারগুলো থেকে তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে কৈলাসের এলাকার গ্লেসিয়ার থেকেই চারটে বিখ্যাত নদী উৎপন্ন হয়েছে ব্রম্ভপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু আর কর্নালি। কৈলাসের মাহাত্ম্য নিয়ে শিন লিং অনেকক্ষন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিল।

আগে দেশটা খুবই গরীব ছিল। এখনও সেরকম উন্নত হয়নি। তবে চীনসরকার তিব্বতের নদীগুলোতে অনেক ধরনের প্রজেক্ট শুরু করেছে। এই নদীর জলের উপরে ভরসা রেখেই যা চাষআবাদ হয়। তবে দেশের খুব কম অংশই আবাদযোগ্য। কৈলাসের দিকের রাস্তা আরো সব্জহীন। এদিকে চাষ আবাদ হয় না বললেই চলে। গ্রীষ্মকালে ঘাস জন্মায় অনেক। আর দলে দলে ইয়াক চড়ে বেড়ায়। রুদ্র গল্প শুনতে শুনতে ঝিমাচ্ছিল।

ঘুম কাটানোর জন্য সে গোপালাচারী ল্যাপটপটা খুলল। মাউন্ট কৈলাসের ভৌগোলিক বিবরন ভালোই জানে রুদ্র। কিন্তু তাকে ঘিরে যে কল্পকথা চালু আছে তার হদিস সে কিছুদিন আগে পর্যন্তও রাখত না। কিছুদিন আগে সে কৌতুহলী হয়ে কাঠমান্ডুতে বসে নেট সার্চ করে আর এরকম প্রচুর ওয়েবসাইটের খবর পায়। তারই কিছু কিছু পছন্দমত কপি করে রেখেছিল ল্যাপটপে, পরে সময় সুযোগমত পড়বে বলে। এখন দিগন্ত বিস্তৃত পাথুরে মালভূমির মধ্যে বসে সেই অজানাকে কল্পনার চোখে দেখতে তার বেশ রোমাঞ্চকর লাগছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পড়ার পরেই মাথাটা তার ঝিম ঝিম করে উঠল। যারা এইসব ওয়েবসাইট বানিয়েছে লোকগুলো সব পাগল। একটা পাহাড়কে পিরামিডের সাথে তুলনা করে দিচ্ছে অনায়াসে। উপরন্তু আবার বলছে সেই পিরামিড নিশ্চয়ই মানুষ বা ভীনগ্রহীরা বানিয়েছে। সাথে কত শত যুক্তি। কৈলাসের চারদিকে নাকি পিরামিডের মতই খাড়া তিনকোনা ঢালু দেওয়াল নেমে গেছে। কৈলাসের পাশের ঢালগুলো নাকি যোগ করলে ১০৮ ডিগ্রী হয়। কৈলাসের পায়ের কাছে যে দুটি হ্রদ। সেগুলো একটা আধখাওয়া চাঁদের মত আর অন্যটা সূর্যের মত গোল। রুদ্রতো এগুলোর কোনটাই ঠিকঠাক দেখতে পারছে না। কৈলাসের উপরের মাথাটা খানিকটা পিরামিড আকৃতি বটে কিন্তু নিচের দিকটা পুরোপুরি স্তম্ভের মত। পুরো পাহাড়টাকে সেই হিসাবে ডিম্বাকৃতি বলা চলে। আর মানস সরোবর খানিকটা গোল হলেও মোটেও পুরো পুরি গোল নয় বরং ভালই এবড়ো খেবড়ো। একই কথা চলে রাক্ষসতাল হ্রদের সম্পর্কেও। আধখাওয়া চাঁদের মত বাদ দিয়ে সে বরং অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের মত দেখতে। এক দিকটা সরু আর অন্য দিকটা চওড়া। উফফ এই ওয়েব সাইট বানানেওয়ালাগুলোর আর কোন কাজ নেই। ভীনগ্রহীরা এসে এইসব নাকি করে গেছে। ল্যাপটপ বন্ধ করে দিয়ে রুদ্র বাইরের প্রকৃতি দেখতে লাগল।

।। আট।।

গসুল মনাস্ট্রির ছাদে দাঁড়িয়ে রুদ্র প্রায় দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলধির রূপ দেখছিল দু চোখ ভরে। এক ঝাঁক বুনোহাস পাড় থেকে সামান্য দূরে জলের মধ্যে ওড়াউড়ি ডোবাডুবি করছে। এই গুম্ফাটা একদম মানস সরোবরের ধারে অবস্থিত। রুক্ষ ধূসর মরুভূমির মাঝে এরকম জলধি সত্যি মনকে নতুন করে সাহস

জোগায়। রুদ্র আজ ভোর না হতেই ছাদে উঠে এসেছিল। সূর্যের প্রথম আলোয় দেখবে মানস সরোবরকে। কিন্তু তার জন্য মানস সরোবরের থেকেও এক বড় বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। কৈলাস পর্বতের চূড়ায় তখন আগুন লেগেছে। অসহ্য বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল রুদ্র কিছুক্ষনের জন্য। অনেক ছোট থেকেই সে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোন পাহাড়কে সে এত সুন্দর দেখেনি। এ যেন এক নিষিদ্ধ স্বর্গের দ্বার, উজ্জ্বল সোনায় মোড়া। সহস্র বছর ধরে ধর্মের মোড়কের অন্তরালে যেন অন্য কিসের হাতছানি। প্রকৃতির এই অনবদ্য ক্যানভাসের সামনে রুদ্র অভিভূত হয়ে পড়ল। দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল কৈলাসের রঙ। গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছিল রঙের জাদু। পলক ফেলতেও ভয় লাগছিল সত্যের। এই দৃশ্য আর কোনদিন দেখতে পাবে না হয়ত। এর এক কনাও হারিয়ে ফেলা পাপ। হ্যাঁ পাপ। সৌন্দর্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে পাপ বলেই মনে করে রুদ্র।

পরশু রাত্তিরটা পায়াংঝেনে কাটবার পর কাল ওরা বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেছিল মানস সরোবরে। পথে প্রথম কৈলাসের চূড়া দেখতে পেয়েছিল পেমা। কাংরিনপোচে বলে চিৎকার করে উঠতে প্রথমে রুদ্র ঠাওর করতে পারেনি কি ব্যাপার। তারপর গাড়ী থামিয়ে সব লামারা নেমে গিয়ে প্রণাম করল আর কীসব মন্ত্র পড়ল, তখন রুদ্রও দূরে ডিম্বাকৃতি চূড়াটাকে দেখল। তার কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য ওরা পৌঁছে গেল মানস সরোবরে। প্রথম দেখাতেই এই হ্রদের বিশালত্ব রুদ্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। চারিদিকে রুক্ষ লালচে বালি পাথরের ধূসরতার মাঝখানে উজ্জ্বল নীল জলখন্ড যেন কোন এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে ফেলছিল তাকে। অন্যান্য লামাদের সাথে রুদ্রও জলে নেমেছিল। মাথায় জল ছুঁইয়েছিল। সে যেন কোন ধর্মবোধে নয় শুধুমাত্র এই প্রাকৃতিক বিস্ময়কে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য। দুপুরের দিকে মানস সরোবর অঞ্চলের আবহাওয়া বেশ ভালোই ছিল। সরোবরের জলটাও এমন কিছু ঠান্ডা ছিল না এত উচ্চতা যেটা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তবে হাওয়া বইছিল ভালোই। অনেকেই জলে নেমে মাথায় জল দিচ্ছেন দেখা গেল। কেউ কেউ ডুব দিয়ে স্নানও করছিল। তবে পাড়ের কাছে অনেকটা জায়গা অগভীর হওয়ার জন্য ডুব দেওয়া মুশকিলের। রুদ্র কতক্ষন জলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল তা তার নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ পেমার ডাকে তার সম্বিত ফিরল। সে পাড়ে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি করে গা হাত মাথা মুছে নিল। মাথায় জল থাকলে তার থেকে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। এখনো তার আসল কাজটাই তো বাকি। অনেকেই হ্রদের ধারে রুক্ষ মাটিতে ঘাসের উপর বসে ছিল। কেউ কেউ এই দীর্ঘ যাত্রার ধকলে শুয়েও পড়েছিল। কিন্তু এইভাবে এখানকার মাটিতে শোয়া বা বসা উচিত নয় বলে শেরপারা বার বার করে সতর্ক করে দিচ্ছিল যাত্রীদের। এত উচ্চতায় মাটি খুবই ঠান্ডা থাকে। হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখানে কোন গেস্টহাউস নেই। বরং মানস সরোবরের তীরে টুরিস্টদের জন্য তাঁবু ফেলা আছে। সবথেকে কাছের গেস্টহাউস আছে চিউ গুম্ফায় সেটা প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে।

কাছাকাছির মধ্যে যে ছোট গুম্ফাটা ছিল রুদ্র আর পেমা তাতে খোঁজ নিতে গেল। সেখানে প্রথমে কেউ বলতে পারল না কাঞ্চেন লামার কথা। রুদ্র একটু হতাশ হল। তাহলে আজকেই কি দারচেন গুম্ফায় যেতে হবে? একজন বয়স্ক লামা দূরে ধ্যানস্থের মত বসে ছিল। সে হাতছানি দিয়ে রুদ্রদের ডাকল। পেমা তার সাথে কথা বলে জানাল যে কাঞ্চেন লামা কিছুদিন আগেই গসসুল গুম্ফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। রুদ্র সাথে সাথে ছুটল শিন লিং কে খুঁজতে। সে যদি তাকে গসসুল গুম্ফায় নিয়ে যেতে রাজি হয়।

এখান থেকে লামারা বিভিন্ন ভাবে মানস সরোবর পরিক্রমা করবেন। কেউ কেউ আশে পাশের গুম্ফায় যাবেন আবার কেউ যাবেন দূরের দারচেন গুম্ফায়। কিন্তু সবটাই পায়ে হেঁটে। তাই শিন লিং-এর আর কোন কাজ নেই। সে পেমা আর রুদ্রকে গসসুল গুম্ফায় নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল। মানস সরোবরের দক্ষিন পাড় দিয়ে পাক খেয়ে গাড়ীটা ছুটে চলল। এখন আর কোন নির্দিষ্ট রাস্তা নেই। ধূলিময় মাঠের উপর বারে বারে গাড়ী যাওয়ার চাকার দাগ ছাড়া। যদিও পাশেই দেখা যাচ্ছে মানস সরোবরের নীল জল। মাঝখানে পড়ল রু গুম্ফা। এখানে একটা ছোট যাত্রীনিবাসও আছে। এখন যদিও রু গুম্ফার চত্বর পুরো ফাঁকা। সাধারনত গাড়ীগুলো সকালবেলায় এইদিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা দারচেন চলে যায় যাত্রীদের নিয়ে। এই গুম্ফাটায় দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল না রুদ্রর। শিন লিং বলল অনেক সময় লামারা পদব্রজে মানস পরিক্রমার সময় এই গুম্ফাগুলোতে বিশ্রাম নেন। সেইরকমই যদি কাঞ্চেন লামাও এখানে এসে থাকেন। পেমাও সায় দিল শিন লিং-এর কথায়।

গাড়ী থামতে পেমাই ছুটে গেল গুম্ফার ভেতরে। একটু পরেই আবার ছুটে বেড়িয়ে এল। নাহ কাঞ্চেন লামা এখান থেকে দুই দিন আগে গোসুল গুম্ফায় রওনা দিয়েছেন। গাড়ী আবার ছুটল কিন্তু এবার ক্রমশ মানস সরোবরকে পিছনে ফেলে রেখে। দক্ষিনে দেখা গেল পঁচিশ হাজার ফুট উঁচু বিশাল দুর্লঙ্ঘ্য গুর্লা-মান্ধাতা পর্বত প্রায় দেওয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। ঐ গিরিবর্ত্মের পাশের রাস্তা ধরেই পেমা নেমে গেছিল ভারতের পথে। এবার মানস সরোবর থেকে দূরে সরতে সরতে আর দেখা যাচ্ছে না নীল জলখন্ডকে। রাস্তা বলতে যে অগ্রবর্তী গাড়ীর চাকার দাগ কোথাও কোথাও তাও নেই। শিন লিং ধূ ধূ এবড়ো খেবড়ো মাঠের মধ্যে দিয়েই কোন এক অনির্দিষ্ট্য লক্ষ্যের দিকে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। দু পাশেই উঁচু উঁচু টিলার সমন্বয়। বিকেল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার নামার মুখে প্রায়। সূর্যের আলো ছাড়া আর এখনো পর্যন্ত আর কোন আলোর ব্যবস্থা নেই এই বিশাল উপত্যকায়। শুধুমাত্র দারচেন গুম্ফায় আলোর ব্যবস্থা করা আছে কিন্তু রাস্তা ঘোর অন্ধকার। শিন লিং-এর মুখও থম থম করছে। সন্ধের আগে গাড়ী নিয়ে সে পৌঁছতে পারবে কিনা গসুল গুম্ফাতে বুঝতে পারছে না। রুদ্র অবশ্য অতটাও দুশ্চিন্তা করছে না। তার কাছে তাঁবু আছে, ম্যাট্রেস আছে, স্লিপিং ব্যাগ আছে, এমনকি টিনের খাবার পর্যন্ত আছে কিছু। যদি তাদের মাঝ রাস্তাতেই রাত কাটাতে হয় তাতেও ভয়ের কিছু নেই।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গসুল গুম্ফা। গুম্ফাটা একদম মানস সরোবরের ধারে। বেশ খানিকটা উঁচু টিলার মাথায়। গুম্ফার চত্বর পর্যন্ত গাড়ী উঠবে না। গাড়ীটাকে নিচে রেখে পাহাড়ের গা বেয়ে মালপত্র নিয়ে উঠে গেল তিনজন।

না রুদ্রদের ভাগ্যই খারাপ। গসুল গুম্ফাতেও কাঞ্চেন লামাকে পাওয়া গেল না। তিনি আজ সকালেও এখানে ছিলেন। কিন্তু দুপুরের পর থেকে তাকে আর কেউ দেখেনি। লামারা এরকমই মাঝে মাঝে কাউকে কিছু না বলেই যাওয়া আসা করে থাকে তাই তাদের জন্য কেউ কোন চিন্তাও করে না। আর কাঞ্চেন লামার তো ঘুরে বেরানোই স্বভাব। গসুল গুম্ফাটা গড়ে উঠেছে একটা পাহাড়ি গুহাকে ঘিরে। প্রদীপের আলোয় ভুতুড়ে অন্ধকার গুম্ফার মধ্যে বসে দুজন লামা ধ্যান করছিলেন। গুম্ফাটা পেমার পরিচিত, সে ঠিক ঘুরে ঘুরে তৃতীয় লামাকে খুঁজে বার করল। সেখানেই তারা সাম্পা আর চা খেল বসে লামার সাথে। আর পেমা তাকে কাঞ্চেন লামার ব্যাপারে প্রশ্ন করে করে উত্যক্ত করে তুলল। রুদ্ররও অনেক কিছু জানার ছিল কিন্তু সে লামার ভাষা

একটুও বুঝতে পারছিল না। পেমা দোভাষীর কাজ করতে শুরু করল। একমাত্র শিন লিং-এরই এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সে সাম্পা আর চা খেয়ে এক কোনায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

ভারতে যাওয়ার আগে পেমা কাঞ্চেন লামার শরীর খুব খারাপ দেখে গেছিল। ভূমিকম্পে কাঞ্চেন লামার কাঁধে আঘাত লেগেছিল। সেই অবস্থা থেকে উনি সেরে উঠেছেন কিনা সেটা জানাই পেমার মূল উদ্দেশ্য। তাতে করে অন্য লামাটি পেমাকে বলল যে উনি নাকি কিছুদিন আগে অবধিও কাঞ্চেন লামাকে একবার কৈলাস পরিক্রমা করতে যেতে দেখেছেন। কৈলাস পরিক্রমা শেষেই উনি গতকাল এই গুম্ফায় এসে ওঠেন বলে তাঁর ধারনা। ওনাকে বিশেষ অধৈর্য্য দেখাচ্ছিল কিন্তু কেন তা তিনি জানে না। তবে আজ সকালে কাঞ্চেন লামাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছিল। সাধারণত লামারা কোন কিছুতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন না। তাই কাঞ্চেন লামার মত বয়স্ক লামার অস্থির হয়ে ওঠা এই লামার মনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। মৃত্যু দরজায় এসে দাঁড়ালেও যারা নিঃশব্দে জপ করতে করতে তার দিকে এগিয়ে যায় সেখানে এমনকি পার্থিব জিনিস আছে যা লামাদেরকে বিচলিত করে তুলবে। এই বলে তিনি তীব্র দৃষ্টিতে পেমার দিকে তাকালেন। পেমা লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে মাথা নিচু করল। যেন কাঞ্চেন লামার বিচলিত হওয়ার দোষটা পেমারই। যাদের সামান্য কারনে বিচলিত হওয়া সাজে তারা যতই লামা সাজুক না কেন তারা ইঞ্জিই হয়। লামার বলা এই কথাটা ইংরাজিতে রুদ্রকে বলার সময় পেমার মুখ সামান্য কঠিন হয়ে উঠছিল।

পরে রুদ্র পেমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে ঐ কথা বলে লামা কি বোঝাতে চাইছিলেন। পেমা বলেছিল যে যেহেতু কাঞ্চেন লামা বিদেশী তাই অনেক লামা তাকে সঠিক বিশ্বাস করেন না। বিদেশীদের তিব্বতী ভাষায় ইঞ্জি বলা হয়। তবে পেমা নিজে কখন কাঞ্চেন লামাকে বিদেশী বলে ভাবেইনি। এই ফর্সা লম্বা সোনালী চুল আর নীল চোখের লামা তার কাছে গুরুতুল্য। রুদ্র জিজ্ঞেস করাতে পেমা লজ্জিত কণ্ঠে কাঞ্চেন লামার চেহারার বর্ননা দিল। সব কিছু শুনে লামাটিকে দেখার আগ্রহ সত্যের আরো বেড়ে গেল।

উনি গসসুল গুম্ফায় থেকে চলে গেছেন শুনে পেমা আরো কীসব যেন জিজ্ঞেস করল বয়স্ক লামাটিকে। এবার লামাটি ওদের নিয়ে গুম্ফার ভেতরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ঘরে গেলেন। একটা ছোট খুপরি ঘর তাতে একটা ছোট জানালা। জানালায় কাঁচ লাগানো। বাইরে আধখাওয়া চাঁদের আলোয় ঝিক ঝিক করছে মানস সরোবর। লামা ওদেরকে বললেন যে কাঞ্চেন লামা আজ সকাল অবধি এই ঘরটাতেই ছিলেন। মূলত কাঞ্চেন লামা এই গুম্ফায় এলে এই ঘরেই তিনি ওঠেন। ওনার জন্য এই ঘরটা আলাদা করেই রাখা থাকে। আজ উনি গুম্ফায় নেই কিন্তু পেমা তার বিশেষ স্নেহধন্য বলে তাকে এই ঘরে থাকতে দিতে লামার কোন আপত্তি নেই। যেখানে আজ সকালেই তিনি বলে গেছেন যে পেমা ফিরে এলে তাকে যেন সর্বতোভাবে সাহায্য করা হয়। পেমা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। বয়স্ক লামা ঘরে একটা প্রদীপ রেখে বেরিয়ে যাবার পরেই সে ফুঁপিয়ে উঠল। তার কেমন যেন ধারন হচ্ছে যে সে আর তার মাস্টার কাঞ্চেন লামাকে দেখতে পাবে না। রুদ্র দুটো ধমক দিয়ে পেমার মন অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল। পেমা গুম হয়ে বসে রইল ঘরের এক কোনে। এই আলো আঁধারীতে মৃত্যুচিন্তায় ঘরের আবহাওয়া ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছিল।

"এই ঘরটায় তুমি আগে থেকেছো কখন?" রুদ্র পরিবেশ হাল্কা করার জন্য বলল পেমাকে।

চোখের জল মুছে ঘাড় কাত করে পেমা জবাব দিল হ্যাঁ।

"গুম্ফাগুলোয় থাকার সময় সাধারনত উনি কি করতেন?"

"লেখা লিখি করত কি সব। প্রচুর লিখত। আর জিজ্ঞেস করলে বলত পৃথিবীর ভবিষ্যত লিখে রেখে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা পেমা, উনি যে অত লেখা লিখি করতেন সেই লেখাগুলোকে কি উনি সাথে নিয়েই ঘুরতেন?"

"হ্যাঁ সব সময়। অনেক সময় কত পাতা পুড়িয়েও ফেলতেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন যে, সব হিসেব লিখে রাখতে নেই।"

"উনি তোমায় কখনো বলেছেন যে উনি কি লিখতেন বা হিসেব করতেন?"

"না। সে সব কথা একদমই কিছু বলত না। তবে আগে মাঝে মাঝে লাসায় যেতেন। অন্য বড় লামারা বলত উনি নাকি আগের দলাই লামার সাথে দেখা করতে যেতেন।"

পেমার সাথে কথা বলে কখনোই বিশেষ কিছু জানা যায়না, রুদ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেঝেতে স্লিপিংব্যাগ পেতে শুয়ে পড়ল। একটু পড়ে লামাটি আবার ফিরে এল রুদ্রদের ঘরে। পেমা উঠে বসল, সাথে রুদ্রও। লামাটি পেমাকে কিসব বলে হাতে একটা লাল হলুদ সুতো দিলেন। লামা চলে যেতে পেমা রুদ্রর কাছে এল।

"উনি আমায় এটা দিয়ে গেছেন, আর বলে গেছেন আমার আশীর্বাদ তোকে দিলাম পেমা। আমার কাজ তুই শেষ করবি।"- গম্ভীর মুখে পেমা বলল।

রুদ্র সুতোর দলাটা হাতে নিল। "কিন্তু এটা কি?"

"ওটা আমাদের আশীর্বাদক সুতোর গ্রন্থি। মাস্টার আমাকে আশীর্বাদ করে গেছে ঐ সুতোটা দিয়ে।"- পেমা ওটা হাতে বাঁধতে উদ্যত হল। রুদ্র ওর কাছ থেকে সুতোটা টেনে নিল। এই সুতোর গ্রন্থির ধরনটা তার খুব চেনা চেনা লাগছে। পেমা অবাক হয়ে তাকাল রুদ্রর দিকে। রুদ্রর কপালে এক গাদা ভাঁজ পড়েছে। সে যেন কোথায় দেখেছে এরকম গিঁট দেওয়া লাল হলুদ সুতো। কিছুতেই মনে পড়ছে না। রুদ্রর মনে হল গুম্ফার দেওয়ালে গিয়ে মাথা ঠুকে নেয় সে। ভীষন চেনা জিনিস এটা।

"এটা আমার কাছে থাকুক। কালকে তুমি নিয়ে নিও।" রুদ্র রেখে দিল সুতোর গুলিটা। পেমা শুতে চলে গেল। রুদ্রর আর ঘুম আসে না কিছুতেই। তন্ন তন্ন করে স্মৃতি হাতড়েও তার মনে পড়ছে না। স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে রুদ্র উঠে পড়ল। জানালার কাছে দাঁড়াল খানিকক্ষণ। বাইরের হাওয়া এখন হিমশীতল। যদিও আরো ঠান্ডা পড়ে। এখন তো শীতকাল নয়। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে ব্লিজার্ড বয় এই সমস্ত জায়গা জুড়ে। চাঁদের আলোয় মানস সরোবর যেন দাঁত বের করে ভেংচি কাটছে রুদ্রকে। ঘরটা একটু একটু করে অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রদীপের সলতেটা পুড়ে পুড়ে ছোট হয়ে গেছে। সলতেটা উসকে দিতেই পাশের তাকে কি একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। রুদ্র ভালো করে দেখল একটা পেতলের মূর্তি। নাড়গোপাল। নাড়গোপাল! এখানে নাড়গোপালের মূর্তি কি করে এল? সাথে সাথে রুদ্রর মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। হ্যাঁ সে এই একই ধরনের সুতো দেখেছিল গোপালাচারীর হাতে। গোপালাচারীকে জিজ্ঞেস করতে উনি হেসে বলেছিলেন এটা আমার নিজস্ব লিপি। উত্তেজনায় ঘুম টুম সব মাথায় উঠে গেল রুদ্রর। সে ছুটে গিয়ে গোপালাচারীর ল্যাপটপটা খুলল। ল্যাপটপে বেশি চার্জ নেই আর। এখানে কোথায় ইলেকট্রিক পাবে কি পাবে না এই ভেবে রুদ্র ভাগ্যিস আরো দুটো স্পেয়ার ব্যাটারী নিয়ে এসেছে।

ফাইলগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে রুদ্র পেয়ে গেল সে যা চাইছিল। লিপি নাম দেওয়া একটা ফোল্ডার। তার ভেতরে আবার টেলিগ্রাম নাম দেওয়া ওয়ার্ডফাইল। সেটা খুলতেই রুদ্র হতভম্ব হয়ে গেল। কিছুই লেখা নেই তার মধ্যে। রুদ্র কিছুক্ষণ হাঁ করে সাদা পাতার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুই নেই। শুধু শুধু সাদা পাতা সেভ করে রাখার মানে কি? তাও আবার ফোল্ডারের মধ্যে? নাহ এইসব বিজ্ঞানীগুলো দেখতে যতই সহজ সরল হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে খুবই জটিল আর প্যাঁচালো হয়। সাদা পাতার দিকে খানিকক্ষন তাকিয়ে থেকে হাল ছেড়ে দিয়ে ফাইল ফোল্ডারগুলো বন্ধ করতে শুরু করল। ফোল্ডারটা বন্ধ করতেই তার কি একটা মনে

হতে আবার সে লিপি নামক ফোল্ডারটা আবার খুলল। ভেতরে টেলিগ্রাম লেখা ওয়ার্ড ফাইল। রুদ্র আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল অতি কষ্টে মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে সামলে নিল। এটা টেলিগ্রামের লিপি। টেলিগ্রামের টরেটক্কার ভাষা, মর্স কোড রুদ্র জানে। কলেজে পড়ার সময় নিতান্ত কৌতুহলে শিখেছিল। ডট আর ড্যাশ। খুবই সহজ। গোপালাচারীরা দুই রঙের সুতো ব্যবহার করেছে। মানে একটা ডট আর অন্যটা ড্যাশ। সুতোর দলাটা নিয়ে রুদ্র একটু নাড়াচাড়া করল। কোন সুতোর গিঁটটা ডট আর কোনটার ড্যাশ? রুদ্র ঠিক করল প্রথমে লালসুতোর গিঁটকে ডট ধরে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করবে। যদি কোন মানে না দাঁড়ায় তাহলে হলুদ সুতো।

ভোর হতে আর কিছুক্ষণ বাকি। রুদ্র পুরো সুতোটাই পড়ে ফেলেছে। কাঞ্চেন লামার ডায়রী আর অন্যান্য যাবতীয় জিনিস তিনি কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছেন তা সবই বলা আছে সুতোতে। সাথে বলা আছে এক অদ্ভুত জিনিস। সেই বাক্যটার মানে বুঝলেও বিশ্বাস করতে মন চাইছে না রুদ্রর। সুতোর লিপির একদম শেষভাগে বলা আছে "আমি আবিষ্কার করেছি কৈলাসের গুপ্তদ্বার।"

কৈলাসের গুপ্তদ্বার? একি কোন গুম্ফার নাম কৈলাস? কৈলাস তো একটা পর্বত, তার আবার গুপ্তদ্বার কি করে হয়? ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠল রুদ্রর। মাথাটা ঠান্ডা করার জন্য সে গুম্ফার ছাদে উঠল। পেমাকে এই সুতো দিয়ে যাওয়ার মানে কি? পেমা কি মস কোর্ড জানে? বা এই সুতোর লিপির মর্ম? মনে তো হয় না। তাহলে নিশ্চয়ই কালকে রুদ্রকে সে কথা বলত। তাহলে কাঞ্চেন লামা বোধহয় ভেবেছিলেন পেমার সাথে গোপালাচারী এখানে আসবেন। তিনি পেমার কাছে এই লাল হলুদ সুতো দেখলেই চেয়ে নেবেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে কিন্তু রুদ্র সামনের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। যেখানে তার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, যেখান থেকে তার দেশে ফিরে যাবার কথা। সেখান থেকে শুরু হল আরেক অনির্দিষ্ট যাত্রা। আরেক অদ্ভুত খোঁজ।

দ্বিতীয় পর্ব

।। এক।।

ঋতিকাকে নিয়ে চক্রেশ বেশ মুশকিলেই পড়েছে। ন্যালম থেকেই ঋতিকার শরীরটা একটু খারাপ লাগতে শুরু করেছিল। মাথা যন্ত্রণা, গা গুলানো এমনকি হাল্কা হাঁপ ধরা পর্যন্ত। প্রথমে ঋতিকা ব্যাপারটাকে অতটা আমল দেয়নি। পাহাড়ী রাস্তায় তার এমনিতেই একটু অস্বস্তি হয়। কিন্তু পায়াং পার হওয়ার পর থেকে ঋতিকা আর মাথাই তুলতে পারছে না। চক্রেশের কাছে বেশ কিছু পাহাড়ী অসুখের ওষুধ ছিল। সবকটাই একে একে ঋতিকাকে সে খাইয়েছে। কোনটাই বিশেষ কাজ দেয়নি। চক্রেশের শত অনুরোধ সত্ত্বেও ঋতিকা কিছুতেই তাদের গাড়ীর ড্রাইভারকে এই ব্যাপারে কিছু জানাতে চায়নি। এখানকার ড্রাইভারদের উপর কড়া নির্দেশ থাকে এরকম কোন ব্যাক্তি অসুস্থ হলে তাকে নিয়ে যেন একপাও আর এগোনো না হয়। বরং পিছিয়ে গিয়ে বর্ডার পার করে দেওয়াটাই তখনও ড্রাইভারদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যেভাবেই হোক ঋতিকা যাবেই। প্রোফেসর নিজে যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলেন যন্ত্রটা। রুদ্র ব্যাপারটা না বুঝতে পারে কিন্তু ঋতিকার মনে কি যেন এক অশুভ উঁকি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

পায়াং-এর পর সবাই এসে মানস সরোবরের তীরে ক্যাম্প করে থাকে। কিন্তু ঋতিকার জন্য সেই রিস্ক আর নেয়নি চক্রেশ। তাকে নিয়ে সোজা চিউ মনাস্ট্রিতে চলে গেছে সে। চিউ মনাস্ট্রির পাশেই একটা গেস্টহাউস আছে। তাদের ড্রাইভার সেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রায় গোটা একদিন ঘুমিয়ে থেকে ঋতিকা একটু সুস্থ হল। তাও তার শরীর খুব দুর্বল। নিরুপায় চক্রেশ এদিক ওদিক খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করল রুদ্রশংকরের। চক্রেশ রুদ্রর একটা ছবি নেট থেকে প্রিন্ট করে এনেছিল। কিন্তু এদিককার কেউই রুদ্রর খবর জানে না। এমনকি দিন দুয়েকের মধ্যে কোন নতুন তীর্থ যাত্রী চিউ মনাস্ট্রিতে আসেনি। দুর্গম পথ না হোক, ভ্রমনের বিলাসটা দুর্লভ হওয়ায় এই রাস্তায় এমনিতেই লোক সংখ্যা সাধারনত কম। তাও আজকাল নেপাল চীন আর ভারতের উদ্যোগে বেশ কিছু যাত্রী হত। কিন্তু এবারের ঐ মারাত্মক ভূমিকম্পের জন্য এদিকের তীর্থযাত্রীর সংখ্যা আরো কমে গেছে। ঋতিকা কোনদিন এইভাবে ঘুরতে অভ্যস্ত নয়। সে উচ্চমধ্যবিত্ত বাড়ীর মেয়ে। যখন যেখানে বেড়াতে গেছে হাতের কাছে পরিষ্কার বিছানা, তোয়ালে, ঘর, বাথরুম পেয়ে সে অভ্যস্ত। তার উপরে এরকম উচ্চতাজনিত শারীরিক অসুবিধাও সে কখনো ভোগ করেনি। কারন হিমালয়ের অত উঁচুতে সে বেড়াতে যায়নি কখনই। তার যাওয়ার মধ্যে সবথেকে উঁচু জায়গা হল কুলুর রোটাং পাস। প্রায় চারহাজার মিটার উঁচু ছিল সেটা। কিন্তু সেখানে মানস সরোবরের রাস্তার সাগা গ্রামই চারহাজার ছয়শোর বেশি। এখানকার হাওয়াও বেশ পাতলা।

ঋতিকা চোখ বুজে শুয়ে ছিল গেস্টহাউসের নোংরা ঘরে। এখন যাত্রীদের সেরকম ভীড় নেই, তাও দুটো আলাদা ঘর দিতে রাজী হয়নি গেস্টহাউসের মালিক। ঘরটা দেখেই নাম কুঁচকে ছিল ঋতিকা। সারি সারি বিছানা। কোনমতে রাত কাটাবার আয়োজন। কমন বাথরুম। কমন বাথরুম শুনেই তো ঋতিকার কান্না পেয়ে যাবার মত অবস্থা। তারপর অতি কষ্টে চক্রেশ একটা অ্যাটাচ বাথরুমওলা চারবেডের ঘর জোগাড় করেছে বেশি টাকা দিয়ে। চক্রেশ কোথায় যেন গেছে। ঋতিকার মাথাটা এতই ধরে আছে যে সে এখনো অবধি দু চোখ ভরে মানস সরোবরটা পর্যন্ত দেখতে পারেনি। গেস্টহাউসের বিছানা কম্বলগুলো থেকে ভ্যাপসা গন্ধ উঠছিল। চক্রেশের অপেক্ষা করে করে শেষমেশ তিতিবিরক্ত হয়ে ঋতিকা বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এখনো তার মাথা টলটল করছে। চক্রেশের দেখা নেই কোথাও। এমনকি ঋতিকাদের ড্রাইভার মায় গাড়ীটা পর্যন্ত নেই। এই জনমানবশুন্য জায়গায় চক্রেশ কি তাকে ছেড়ে রেখে পালিয়ে গেল নাকি! এই অদ্ভুত চিন্তাটা মাথায় আসতেই নিজেরই হাসি পেল ঋতিকার। অক্সিজেনের অভাবে তার স্নায়ু খুবই দূর্বল হয়ে উঠেছে। গত কয়েকদিন ধরে সে যে কত উল্টো পালটা স্বপ্ন দেখছে তার কোন ঠিক নেই।

হাঁপধরা কষ্টটা নিয়েই ঋতিকা একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগল মানস সরোবরের দিকে। একবারে তীরে পৌঁছে সে বসবে কিছুক্ষণ এই হ্রদটার ধারে। কিন্তু একটু যাওয়ার পরেই তার চোখটা কেমন ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। বুকের ব্যাথাটা আরো বেড়ে উঠছে। আর এগোনো ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না ঋতিকা। সে একবার অতিকষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল গেস্টহাউস থেকে সে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ঋতিকা আবার এগোতে শুরু করল। কোনমতে হ্রদের ধারে এসে সে ধপ করে পাথুরে মাটির উপর বসে পড়ল। তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এতকষ্ট হচ্ছে যে মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে কে যেন ক্রমাগত সুঁচ বিধিয়ে চলেছে। ঝাপসা চোখে হাঁ করে কোনমতে ফুসফুসে হাওয়ায় ভরার চেষ্টা করতে করতে ঋতিকা দেখল হ্রদ থেকে কে যেন উঠে আসছে তার দিকে। মানুষটার দীর্ঘ গাঢ় লাল বসন সে দেখতে পাচ্ছে। মানুষটা এসে তাকে ধরল, তা না হলে ঋতিকা মাটিতেই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল আরকেটু হলে। ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে। ঋতিকা কোনমতে বলল শ্বাস নিতে পারছে না সে। লাল বসনের আড়াল থেকে কি একটা তরলের বোতল বার করে তিনি ঋতিকার গলায় ঢেলে দিলেন কয়েক ফোঁটা। তারপর নিজের কম্বল বিছিয়ে ঋতিকাকে শুইয়ে দিলেন তার উপরে। সেই অদ্ভুতগন্ধী তীব্র তরল নিমেষের মধ্যে ঋতিকার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস

সহজ করে দিল। একটু পরে ঋতিকা দেখল বুকের আর মাথার ব্যাথাও চমকপ্রদভাবে কমে আসছে। সে আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করতেই, ভদ্রলোক তাকে ইংরাজীতে উঠতে মানা করলেন।

শুয়ে শুয়ে ঋতিকা এবার ভালো ভাবে দেখল ভদ্রলোককে। এরকম রক্তলাল বসন সে আগেও দেখেছে। ভদ্রলোক একজন লামা। কিন্তু এর আগে সে কোন লামার এরকম মানস সরোবরের মত প্রশান্ত গভীর নীল চোখ দেখেনি। ইনি একজন বিদেশি লামা। সম্ভবত ইউরোপের কোন দেশ থেকে ইনি এসেছেন এখানে। বিদেশী লামার ভালোই বয়স হয়ে গেছে। সে তাঁর সাদা চুল আর কুঁচকে যাওয়া চামড়া দেখলেই বোঝা যায়। তিনি প্রশান্ত মুখে ঋতিকার পাশে বসে বসে জপযন্ত্র ঘোরাচ্ছেন আর ওঁ মনিপদ্মে হুম জপছেন।

একটু পরে ঋতিকার বেশ সুস্থ লাগল। মাথা ব্যাথাটা একেবারে ম্যাজিকের মত কমে গেছে। শ্বাসকষ্টটাও নেই আর। শুধু বুকের মধ্যে এখনো একটু খচ খচ করছে। তবে ঋতিকা বুঝতে পারছে আর কিছুক্ষণ পরে ওটাও আর থাকবে না। তিব্বতে পা দেবার পর থেকে তার নিজেকে এতটা সুস্থ লাগে নি কখনো। ঋতিকা এবার উঠে বসলে লামা আর বাধা দিলেন না। থলে থেকে কি একটা বার করে খেতে দিলেন ঋতিকাকে। দ্বিধা না করে ঋতিকা সেটা মুখে পুরে দিল।

"এটা কি ছুপরি?" অদ্ভুত গন্ধওয়ালা দুধের কিউবটা চুষতে চুষতে জিজ্ঞেস করল ঋতিকা। লামা অল্প হেসে ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ।"

ইয়াকের দুধকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে রেখে একধরনের চৌকো বিস্কুটের মত কিউব তৈরি করা হয়। এগুলো সহজে গলে না। বহুদিন অবধি রেখে দেওয়া যায়। তেষ্টার সময় মুখে নিয়ে চুষলে জলের কাজ করে। আবার এনার্জিও পাওয়া যায় এই জমানো দুধের থেকে। ছুপরি জিনিসটা এক দু ঘন্টা অবধি মুখে থেকে যায় অনেক সময়।

ঋতিকা লামাকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করল। লামা হাসলেন। বললেন, কাঞ্চেন লামা। ঋতিকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে লামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এই সেই কাঞ্চেন লামা? যার জন্য রুদ্র, পেমা এমনকি সে পর্যন্ত কলকাতা থেকে এতদূর ছুটে এসেছে। রুদ্র তাকে এতকিছু বলেছে আর এটাই বলেনি যে কাঞ্চেন লামা বিদেশি! ঋতিকা আর ধৈর্য বজায় রাখতে পারল না। সে রুদ্রর কথা জিজ্ঞেস করে বসল লামাকে, "আপনার সাথে দেখা হয়েছে রুদ্রশংকরের?"

লামা হাসি হাসি মুখে মাথা নেড়ে বললেন যে তিনি এরকম কারোর নাম শোনেননি।

ঋতিকা অধৈর্য হয়ে উঠল, কথার পরম্পরা ছেড়ে সে বলে উঠল, তারা তো আপানকে খুঁজতে এখানেই এসেছে। প্রোফেসর গোপালাচারীর তৈরি করা যন্ত্র নিয়ে। দেখা হয়নি তাদের সাথে আপনার?

লামার মুখ এবারে গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "তুমি গোপালাচারীর যন্ত্রের ব্যাপারে কি জানো?"

ঋতিকা তাকে সব খুলে বলল, কিভাবে গোপালাচারী খুন হওয়ার পরে রুদ্র তাকে কাঠমান্ডুতে ডেকে এনে তাঁর সাহায্যে ঠিক করে তৈরি করে যন্ত্রটা। এমনকি রুদ্র বারন করা সত্ত্বেও সে তার বন্ধুকে নিয়ে এখানে এসেছে। কারন সে মনে করে সেই যন্ত্র যেখানে লাগাবার জন্য পাঠানো হয়েছে সেটা কোন ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া একা রুদ্রর পক্ষে সম্ভব নয়। রুদ্র যে এই কাঞ্চেন লামাকেই পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কথাও বলল তাকে।

সব শুনে লামার মুখে একটা বিষন্ন হাসির রেখা দেখা গেল। তিনি কৈলাস চূড়ার দিকে তাকিয়ে দুহাত ভরে প্রণাম করলেন। "ভগবান সর্বশক্তিমান তোমার সাথে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছেন। আমার সাথে রুদ্রর আর দেখা হবে না। তবে তোমাকে আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। ভগবানের আশ্রয় কৈলাস ছাড়া আর কাউকে কখনো বিশ্বাস করো না।"

"কিন্তু কেন? রুদ্ররা হয়তো এই মানস সরোবরের আশেপাশেই কোথাও একটা আছে। ওরা এখানেই আসবে। আপনার সাথে দেখা হবে না কেন?"

"কারন আমার হাতে আর সময় নেই। আমার পথ চলা শেষ হয়েছে। আমি আর কিছুক্ষনের অতিথি মাত্র এই পৃথিবীতে।"

কথাগুলো শুনে ঋতিকা অবাক হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। লামা তার হাতের মুঠো খুলল। একটা ছোট রূপালী তীর ঝিকিয়ে উঠল। "এটা? এটা? আমি জানি এটা কি?" প্রায় দমবন্ধ করে ঋতিকা বলল, সে হাত বাড়াল তীরটা নেবে বলে। লামা দ্রুত হাত সরিয়ে নিলেন। "একদম ছুঁয়ো না। মারাত্মক বিষ এটা। একবার গায়ে লাগলে মৃত্যু অবধারিত।"

ঋতিকা বড় বড় চোখে চাইল কাঞ্চেন লামার দিকে, "এই একই তীর দিয়ে প্রোফেসরকেও মারা হয়েছিল। তার মানে যারা ওনাকে মেরেছিল তারা এখানেও এসেছে?"

"হ্যাঁ এসেছে। ওদের জন্যই আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। একটু আগে আমাকে ওরা প্রায় ধরে ফেলেছিল কিন্তু আমি পালিয়ে আসি চিউ-এর দিকে। তখনই ওরা তীরটা ছোঁড়ে।"

"কিন্তু ওরা আপনাকে মারতে চাইছে কেন? আপনি জীবিত থাকলেই তো ওদের সুবিধা।"

"হয়ত মারতে চায়নি। ভয় দেখাতে চাইছিল। বা হয়ত মারতেই চাইছিল। ওরা ভেবেছে আমায় মারলেই সব পেয়ে যাবে।"

ঋতিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি পেয়ে যাবে?"

কাঞ্চেন লামা ঋতিকার হাতে একটা ইঞ্চি ছয়েকের সরু লম্বাটে শিশি দিল, "রেখে দাও যত্ন করে। পথ খুঁজে না পেলে ব্যবহার কর। আর দেখো কেউ যেন না জানে কোনদিনও সেই পথের সন্ধান।" এই কথাগুলো বলতে বলতেই কাঞ্চেন লামার হাত অবশ হয়ে আসছিল। শিশিটা গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই ঋতিকা সেটা ধরে ফেলল। কম্বলের উপর থেকে তড়িঘড়ি উঠে সে কাঞ্চেন লামাকে শুইয়ে দিল সেখানে। একটা জীপের আওয়াজ শুনে সে পিছনে তাকিয়ে দেখল চক্রেশ আর তাদের শেরপা গাড়ী নিয়ে ফিরে এসেছে। ঋতিকা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল শিশিটা জামার ভেতরে। চক্রেশ ঋতিকাকে দেখে জিপ থেকে নেমে ছুটে এল। "একী? ইনি কে? কি হয়েছে?"

"তুমি তাড়াতাড়ি গুম্ফায় খবর দাও। উনি অসুস্থ মনে হচ্ছে।" ঋতিকা ঠোঁট টিপে কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে।

ঋতিকাদের গাড়ীর ড্রাইভার ততক্ষনে গাড়ী নিয়ে ছুটে গেছেন চিউ গুম্ফায়। চক্রেশ এসে ঋতিকার পাশে বসল। "কিভাবে হল? কিছু বলেছেন তোমায়?"

ঋতিকা বলতে যাচ্ছিল চক্রেশকে যা যা ঘটেছে, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেল। চক্রেশ কাঞ্চেন লামার অন্য পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। লামা একবার চোখ মেলে চক্রেশকে দেখে কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু তার কথা বন্ধ হয়ে গেছিল। শেষবারের মত কাতর চোখে ঋতিকার দিকে তাকিয়ে তিনি চোখ বুজলেন। ঋতিকা কেঁদে উঠল। ততক্ষনে ঋতিকাদের শেরপা চিউ গুম্ফা থেকে লামাদের নিয়ে চলে এসেছে। চক্রেশ ঋতিকাকে সরিয়ে নিয়ে গেল কাঞ্চেন লামার কাছ থেকে। অন্যান্য লামারা কাঞ্চেন লামাকে ঘিরে বসে মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন আর জপজযন্ত্র ঘোরাতে লাগলেন। ঋতিকাকে গাড়ীতে বসিয়ে চক্রেশ ড্রাইভারকে বলল "তুমি এখানে বস।" "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" ঋতিকা চক্রেশের হাত টেনে ধরল।

"না আমি দেখি কোনভাবে ঐ লামাকে সাহায্য করা যায় কিনা। অন্যান্য লামারা তো শুধু মন্ত্রই পড়ছে।" ঋতিকা হাত ছাড়ল না। "আমি একা থাকব না।"

" দ্'মিনিট। একা কোথায়? এই তো শেরপা রইল। তুমি গাড়ীতে বসো আমি এক্ষুনি দেখে আসছি।" –এই বলে চক্রেশ ছুটে চলে গেল লামার কাছে।

একটু পরে চক্রেশ ফিরে এল। তার মুখটা সামান্য থমথমে। "নাহ কিছুই করতে পারলাম না। চলো হোটেলে চলো।" গাড়ী থেকে নেমে এল ঋতিকা। চক্রেশ তার কাঁধ ধরল যাতে করে ঋতিকা পড়ে না যায়। "তোমার শরীর কেমন?"

ঋতিকা তাকাল চক্রেশের দিকে। চক্রেশ তার এত যত্ন করছে খেয়াল রাখছে কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন কিছুতেই তাকে সত্যিটা বলতে দিল না- "সুস্থবোধ করছিলাম বলেই একটু হ্রদের ধারে এসেছিলাম। কিন্তু যা হল। চল হোটেলে ফিরে চল।" চক্রেশের হাত জড়িয়ে ধরে ঋতিকা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল গেস্টহাউসের দিকে। যেতে যেতে নিজের অজান্তেই একবার হাত ছোঁয়াল জ্যাকেটের পকেটে। শিশিটা আছে তো? যে করেই হোক রুদ্রদের সাথে দেখা করতেই হবে। কাঞ্চেন লামা তাকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়েছে আর যে বা যারা কাঞ্চেন লামাকে মেরেছে তারা নিশ্চয়ই খারাপ লোক। রুদ্ররা এখানে কাঞ্চেন লামার সাহায্যর জন্যই আসছিল। রুদ্রকে আর খারাপ ভাবার কোন কারন দেখতে পেল না ঋতিকা। বরং চক্রেশকে এখনই সব কথা বলবে কিনা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সে। চক্রেশের এদিকে আসার এতটুকু ইচ্ছা ছিল না। এখন এই সব শুনে যদি আর একদিনও থাকতে না চায়। আগে তো রুদ্রর সাথে দেখা হোক তারপরে নতুন করে ভাববে সব কিছু ঋতিকা।

।। দুই।।

রুদ্র আর পেমা বেশ সকাল সকালই এসে পৌঁছল চিউ গুম্ফায়। তারা আজকে যাবে দারচেন গুম্ফায়। তারপর কৈলাস পরিক্রমন শুরু হবে। কাঞ্চেন লামা এক অদ্ভুত জায়াগায় রেখে গেছে তার ডায়রী। ডায়রীটা না পাওয়া পর্যন্ত রুদ্র কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সে বুনো হাঁসের পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে কি না তাও কিছু বুঝতে পারছে না। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাকে পথে ঠেলে দিল সে মারা গেল। যার কাছে শেষ দায়িত্বের ভারমুক্ত হবে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পেমার ইচ্ছা ছিল একেবারে দারচেন গুম্ফায় যাওয়ার। কিন্তু রুদ্র ঠিক করেছে সে প্রতিটা গুম্ফা ঘুরে দেখে যাবে। যদি কোন গুম্ফায় কাঞ্চেন লামার খবর পাওয়া যায়। তবে রুদ্র ভাবতে পারেনি যে প্রথম গুম্ফাতেই সে খবর পেয়ে যাবে। চিউ গুম্ফায় গাড়ী থামতেই পেমা ছুটে গেল ভেতরে। কিছুক্ষন অপেক্ষা করেও পেমা বেড়িয়ে আসছে না দেখে রুদ্র ঢুকল গুম্ফাটায়। একজন লামা বোধহয় তারই জন্য গুম্ফার দ্বারের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। রুদ্র তাকে পেমার কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি রুদ্রকে নিয়ে গেলেন গুম্ফার ভেতরে একটা ঘরে। ঘরে বেশ কয়েকজন লামা বসে নিচু গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারন করে চলেছেন। ধূপ আর কিসের ধোঁয়ায় ঘর পরিপূর্ন। দিনের বেলাতেও ঘরে আবছা অন্ধকার। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্র দেখল একজন বিদেশী বৃদ্ধ লামা শুয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। তার চারিদিকে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। পায়ের কাছে পেমা বসে। পেমা মুখ তুলে তাকাল রুদ্রর দিকে। তার চোখের কোলে জল টলটল করছে। চিবুক বেয়ে নেমে এসেছে জলের ধারা। শায়িত লামার দিকে তাকিয়ে রুদ্র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

রুদ্র গুম্ফার বাইরে বসে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছিল। অসম্ভব ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তময় চারিধার। এরকম জায়গায় বেশিদিন থাকলে সন্ন্যাস নিতে প্রতিটি মানুষের আপসেই ইচ্ছা করবে। এরকম নির্মল জায়গাতেও মৃত্যু নেমে আসে আচম্বিতে। পেমা এবং অন্যান্য লামারা কাঞ্চেন লামাকে দাহ করতে নিয়ে গেছে। আজ

সন্ধের মধ্যে দারচেন গুম্ফায় চলে যাবে রুদ্র, পেমা যদি এখানে থেকে যেতে চায় ওকে রেখেই যেতে হবে। রুদ্র পায়ে পায়ে সরোবরের দিকে এগিয়ে গেল। সরোবরের ফাঁকা পাড়ে আরেকজন বসে আছে। রুদ্রর দিকে অর্ধেক মুখ ঘোরানো। সে দূরে কৈলাস পর্বতের দিকে তাকিয়ে আছে। হাওয়ায় খোলা চুল উড়ে উড়ে পিঠে গলায় ঝাপট খাচ্ছে। রুদ্রর বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে ঠিক দেখছে তো? কিন্তু সে কি করে সম্ভব? দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল রুদ্র।

গলা খাঁকরানির শব্দে ঋতিকা একটু হতভম্ব হয়ে পিছনে ফিরল। রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে।

"আপনি? রুদ্র। কখন এসেছেন?"

"অনেকক্ষন। কিন্তু আপনি এখানে? কি ব্যাপার? আপনাকে না আমি কাঠামান্ডুগামী বাসে তুলে দিয়েছিলাম?"

ঋতিকা একটু লাজুক হাসল, তারপরে একটু ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "আপনাকে অনেক কথা বলার আছে রুদ্র। আপনি খুব দেরী করে ফেলেছেন। জানেন কিছু?"

রুদ্র উদাস চোখে হ্রদের দিকে তাকাল, "হ্যাঁ জানি। কাঞ্চেন লামা মারা গেছেন। পেমা আর অন্য লামারা তাকে দাহ করতে নিয়ে গেছে।"

ঋতিকা একটু মুখ নামিয়ে আনল রুদ্রর কাছে, চাপা গলায় বলল, "কিন্তু ওনাকে খুন করা হয়েছে।"

রুদ্র চমকে উঠল, "সে কি? আপনি কি করে জানলেন?"

"উনি মারা যাওয়ার আধ ঘন্টা আগে আমার সাথে দেখা হয়েছিল ওনার। উনি আমাকে একটা ছোট বিষ মাখানো তীর দেখিয়েছিলেন। উনি নিজেই আমাকে বলে গেছেন যে ঐ বিষেই ওনার মৃত্যু হয়েছে।"

"বলেন কি? তীরটা কোথায়? আপনার কাছে?"

ঋতিকা ঘাড় নাড়ল। তীরটা কোথায় সে জানে না। তবে কাঞ্চেন লামা মারা যাওয়ার সময় বারবার কৈলাস পর্বতের দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু একটা বলতে চেয়েছেন। ঋতিকা রুদ্রর থেকেও লুকিয়ে গেল শিশিটার কথা। সে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

রুদ্র জানাল যে তারা বিকেলবেলাই দারচেন গুম্ফায় যাবে। সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়ার কিছু সূত্র হয়ত পাওয়া যাবে। ঋতিকা এতদূর যখন এসেছেই তখন তার সাথে দারচেন গুম্ফা অবধি কি যেতে পারবে না?

ঋতিকা একটু ইতঃস্তত করল, "আমার মনে হয়েছিল আমাকে হয়ত শেষ কালে আপনার প্রয়োজন হবে। কারন কোন ভালো ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কেউ ওই সার্কিট বোর্ড লাগাতে পারবে না। আপনি নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ার নন?"

রুদ্র মাথা ঝাঁকাল, "না। আমি ইঞ্জিনিয়ার নই। কিন্তু আপনি অনবদ্য ঋতিকা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না এরপরে কি করব ঐ সার্কিট বোর্ড নিয়ে। আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন? শুধু আমাকে নয় আমার মনে হয় আপনি এক বিশাল ভূখন্ডেরও অনেক উপকার করতে চলেছেন। আমাদের এখন শুধু যন্ত্রটা খুঁজে বার করতে হবে।"

ঋতিকা একটু থেমে থেকে বলল, "আমার বন্ধুও এসেছে আমার সাথে। ওর সাথে কথা না বলে আমি আপনাকে কিছুই ঠিকঠাক বলতে পারবো না। আপনি যদি তাকে একটু বুঝিয়ে বলেন। বুঝতেই পারছেন আমাকে কিডন্যাপ করাটা ওর নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি।"

রুদ্র একটু হকচকিয়ে গেল, এত ঘটনা একের পরে এক ঘটে চলেছে যে ও কিডন্যাপের ঘটনাটা সম্পূর্ন ভুলেই গেছিল। তারপর মনে পড়তেই ও একটু লজ্জিত হল, "ইসস। একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিলাম। আমি অবশ্যই ওনাকে বুঝিয়ে বলব। কোথায় উনি?"

"জানি না গুম্ফার দিকে গেছে কিনা? চলুন ঐ দিকটা দেখে আসি একবার।"

দুজনে গুম্ফার দিকে হাঁটতে লাগল। এতক্ষনে রুদ্রর মনটা একটু হাল্কা হাল্কা লাগছে। ও এমন কাউকেই পাচ্ছিল না যার সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু ও বুঝতে পারছে না সব কথা খুলে ঋতিকাকে বলে দেবে কিনা। বলে দেবে কি সুতোর কথাটা? না থাক। পরে দেখা যাবে। ওর সাথে যে ছেলেটা আছে সে কেমন আগে দেখা যাক।

।। তিন।।

রুদ্রদের জিপটাতেই সবাই মিলে যাচ্ছে এখন। শিন লিং গাড়ী চালাচ্ছে। ঋতিকাদের গাড়ীটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুপুরের মধ্যেই দাহকার্য সমাপ্ত হয়ে গেছে। পেমার মত উচ্ছল ছেলে একেবারে থম মেরে গেছে। সে কারোর সাথেই কোন কথা বলছে না। ঋতিকার শরীর এখন একদম সুস্থ। শুধু চক্রেশকে বোঝাতেই রুদ্রর অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে। ঋতিকা রুদ্রর সাথে চক্রেশের পরিচয় করাতেই চক্রেশ একটা ঘুঁষি মেরে রুদ্রকে অভিবাদন জানিয়েছিল। তারপর হয়ত আরো ঘুঁষি লাথি রুদ্রর ভাগ্যে জুটত যদি না ঋতিকা চক্রেশকে আটকাতো। অতিকষ্টে চক্রেশকে রাজী করানো গেছে। ঋতিকা সাহায্য না করলে কোনমতেই এটা সম্ভব হত না।

চিউ থেকে দারচেন যেতে বেশি সময় লাগে না। দূরত্ব মাত্র তিরিশ কিলোমিটার। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে কৈলাস পর্বতটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছিল। এটাই রুদ্রকে টানছিল বেশি করে। পেমার সাথে কোন কথা হয়নি রুদ্রর। রুদ্র ভেবেছিল পেমা হয়ত আর তার সাথে যাবে না। কিন্তু সবাই যখন গাড়ীতে ওঠার জন্য রেডি হল তখন পেমায় তার কম্বলের প্যাঁটরা নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। রুদ্র কিছু জিজ্ঞেস করেনি পেমাকে। এই শোকটা সামলাতে পেমার সময় লাগবে। ওকে সময় দেওয়া উচিত এখন।

চিউ মনাস্ট্রিটা মানস সরোবরের তীরে অবস্থিত। আর দারচেন একেবারে কৈলাসের কোলের কাছে। দারচেন একটা ছোটখাটো তিব্বতী গ্রাম। এখানকার মনাস্ট্রিটাও অন্যান্য মনাস্ট্রির থেকে অনেকটা বড়। দারচেনে বেশ কিছু হোটেল আছে। এখান থেকেই যাত্রীরা কৈলাস পরিক্রমা শুরু করে। সেইজন্য এখানে মালবওয়া কুলি আর পাহাড়ী ঘোড়াদের আড্ডা। দারচেনের একটা হোটেলে চার বেডের একটা ঘর পাওয়া গেল। বেশী টাকার কড়ারে পুরোটাই দখল করল চক্রেশ আর ঋতিকা। পেমা দারচেন গুম্ফায় নিয়ে যেতে চাইছিল রুদ্রকে। আবার ঋতিকা চাইছিল রুদ্র তাদের সাথেই থাকুক। শেষমেশ রুদ্র পেমার সাথেই গুম্ফার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। তাকে একবার সপ্তর্ষি গুহায় যেতে হবে। কিন্তু ঋতিকা আর চক্রেশকে কিভাবে ফাঁকি দেবে সেটা সে বুঝতে পারছিল না। পেমার সাথে গুম্ফায় থাকলে অন্ততঃ সারাক্ষন ওদের চোখের উপরে কাটাতে হবে না। কাঞ্চেন লামার ডাইরী না পাওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই পথ ঠিক করতে পারছে না।

রুদ্ররা ঋতিকাদের হোটেলে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যখন দারচেন গুম্ফায় এল তখন অস্তরাগের ছটায় কৈলাস দিনের শেষ স্নান করে নিচ্ছে। পেমা গুম্ফায় একটা ঘরের ব্যবস্থা করল। সাম্পা আর চা খাওয়ার পর ঘরে ঢুকে সারাদিনের পরে এই প্রথম কথা বলল পেমা।

"সপ্তঋষি গুহায় যাওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছো রুদ্র দা?"

হঠাত করে পেমার কথায় রুদ্র একটু চমকে উঠল, "না এখনো কিছু ভাবি নি। তুই কিছু ভাবলি?"

"আমি শিন লিং-এর সাথে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কাল ও সকাল বেলাই চলে আসবে। এখান থেকে শিলুং গুম্ফা অবধি গাড়ীতে চলে যাবে। তারপরে পায়ে হাঁটা। শিন লিং বলেছে বিকেলের মধ্যে তোমরা ফেরত চলে আসতে পারবে।"

কাঞ্চেন লামার মৃত্যু যেন এক ধাক্কায় পেমাকে অনেকটা বড় করে তুলেছে। রুদ্র অবাক হয়ে তাকিয়েছিল পেমার দিকে। পেমার কথা থামলে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই যাবি না আমার সাথে?"

- "না, আমি গেলে এখানে ওনাদেরকে ধরে রাখবে কে? আর তাছাড়া আমার মন বলছে আমাদের কৈলাস পরিক্রমা করতে হবে। তার জন্য একস্ট্রা কিছু জিনিসপত্র লাগবে। তাঁবুও লাগতে পারে। আমি কালকে এখানে থেকে সেসবের ব্যবস্থা করব।"

রুদ্র একটা উদ্যত হাই চাপা দিল। "তোর যা মনে হয়।"

তখুনি দুজনে শুয়ে পড়লেও অনেক রাত অবধি রুদ্রর ঘুম এলো না। নিস্তব্ধ ঘরে দেওয়াল প্রদীপের হালকা নাচন দেখতে দেখতে সে অনুভব করছিল অন্য বিছানাতে পেমাও একই ভাবে জেগে আছে। অনেক কিছু আবোল তাবোল চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসছে তার। বিশেষ করে গোপালাচারীর কথাই ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে। ভদ্রলোক অনেক কিছু জানতেন। আজ তিনি থাকলে রুদ্রর এতো দুশ্চিন্তাই থাকত না।

পুরোন কথা ভাবতে ভাবতে রুদ্র কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তার মনেও নেই। ভোরবেলা পেমার ডাকে তার ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি উঠে রেডি হয়ে নিল রুদ্র। পেমা তিব্বতী চা নিয়ে এসেছে। একটু পরে শিন লিংও এসে যাবে। রুদ্র তার রুকস্যাকে টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছে। পেমা আগেই বলেছিল যে সপ্তর্ষী গুহায় উঠতে গেলে খানিকটা বরফ পাহাড় ডিঙ্গোতে হয়। সেই মত আইস এক্স, রোপ আর কাঁটাওয়ালা বুট নিয়ে নিয়েছে রুদ্র। প্যাকেট লাঞ্চ শিন লিং নিয়ে আসবে। আর শিলুং গুম্ফায় তারা প্রাতঃরাশ করে নেবে সাম্পা আর চা দিয়ে।

শিন লিং গাড়ী নিয়ে আসতেই রুদ্র বেড়িয়ে পড়ল। গাড়ীতে ওঠার আগে পেমা তার হাতে একটা লাল সুতো বেঁধে দিল তিব্বতী মন্ত্রোচ্চারন করে। তখনও ছোট গ্রামটায় কোন চাঞ্চল্য জাগে নি। তিব্বতীরা এমনিতেই একটু বেলা করে ওঠে। ভালো করে রোদ না উঠলে তারা লেপের তলা ছাড়তে চায় না।

শিলুং গুম্ফা অবধি সব ঠিকঠাক চলল। কৈলাস পর্বত ওঠা নিষিদ্ধ কিন্তু তার দক্ষিন মুখে পাহাড়ের গায়ে একটা দীর্ঘ ফাটল আছে। সেখানে অনেকেই যায়। বিশেষ করে লামারা। ঐ গুহার সামনে তারা অনেক চর্তেন বানিয়ে রেখেছে। জায়গাটাকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে তিব্বতীরা। শিলুং গুম্ফাই এই রাস্তার শেষ আশ্রয়স্থল। সেখানে গাড়ী রেখে ওরা প্রাতঃরাশ সেরে নিল। এবার পায়ে হাঁটা পথ। শিলুং গুম্ফার পর থেকেই একটু একটু করে বরফের রাজত্ব শুরু হচ্ছিল। অষ্টাপদ পর্বতকে একধারে রেখে সরু গিরিপথ ধরে রুদ্র আর শিন লিং হাঁটতে লাগল। প্রায় দু ঘন্টা হাঁটার পরে ওরা একটা বরফের নদী পেল। সিলুং আর কৈলাস গঙ্গার মিলন স্থল। নদীর উপরে বরফ একটু আলগা। সেইটুকু পেরোতেই রুদ্র আর শিন লিং-এর প্রায় আধঘন্টা লেগে গেল। তারপরেই তিব্বতীদের বিখ্যাত তীর্থস্থান লিং সিঞ্জেন। একটা পাথরের গায়ে ঘোড়ার খুরের ছাপের আদল। সেটা পেরোতে একটা ঝুরো বরফের মাঠ পেল রুদ্ররা। প্রতি পদক্ষেপে পা প্রায় হাঁটু অবধি ঢুকে যাচ্ছে। নদী পেরনোর সময়ই গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছিল। এখন রীতিমত বরফের বৃষ্টি হচ্ছে। কালো হয়ে গেছে চারিধার। দৃষ্টিসীমা অত্যন্ত কমে এসেছে। মাত্র দু তিন মিটার সামনে এগিয়ে যাওয়া শিন লিং-কেই রুদ্র আবছা মত দেখতে পাচ্ছে। মাঠের মাঝখানে দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই। আবার থেমে থাকলে বরফে চাপা পড়ার সম্ভবনা। রুদ্র আর শিন লিং কোনমতে এগিয়ে যেতে লাগল।

মধ্যাহ্নে দুজনে অতিকষ্টে এসে থামল কৈলাস পর্বতের দক্ষিন ধারের পায়ের কাছে। একটু আগেই তারা পেরিয়ে এসেছে নন্দী পর্বত। হাঁপ নিতে দুজনেই বসে পড়ল পাথরের উপরে। এখনো ট্রেকিং-এর

সবথেকে গুরুত্বপূর্ন অংশটাই বাকি। এবার তাদেরকে একটা প্রায় খাড়াই পাথুরে দেওয়াল বেয়ে উঠতে হবে একশো মিটারের মত। নিচ থেকে ফাটলটা চোখে পড়ছে রুদ্রর। বিশেষ করে সেখানে অনেক রঙ বেরঙ্গের কাপড় উড়ছে। মাঝে মাঝে চৈতর্নের সোনালি চূড়াগুলো ঝিলিক দিচ্ছে।

একটু বিশ্রাম নিয়ে আর কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে দুজনে এবার উঠতে শুরু করল পাহাড়ের গা বেয়ে। রুদ্র একজন মাউন্টেনিয়ার বলেই তার কাছে এই রাস্তাটা তার কাছে সেরকম কিছুই নয়। কিন্তু সাধারন ট্রেকারদের পক্ষেও এই পথ পার করা বেশ মুশকিলের ব্যাপার। শিন লিং যে দক্ষ শেরপা সেটা তার পাহাড়ে চড়া দেখেই বোঝা যায়। শেষ শৈলশিরাটার উপরে একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে পড়ল রুদ্র। শিন লিং হাত ধরে টেনে তুলে নিল রুদ্রকে।

অনুভূমিক ফাটলটায় বৌদ্ধরা অনেক স্তুপ আর চর্তেন বানিয়ে রেখেছে। এছাড়াও হিন্দু, জৈন আর বোঁ-দেরও বেশ কিছু পবিত্র উপাচার দেখতে পেল রুদ্র। শিন লিং তাদের ব্যাগদুটোকে টেনে তুলছে। এই ফাঁকে রুদ্র গুহার ভেতর দিকটায় ঢুকে এল। বৌদ্ধরা ভেতরের দেওয়ালটাকে লাল রঙ করেছে। গুহা বলতে যে সুড়ঙ্গের মত আমরা বুঝি সপ্তঋষি গুহা ঠিক সেরকম নয়, বরং একে এক বিশাল অনুভূমিক ফাটল বলা যেতে পারে। অনেকটা পাহাড়ের গায়ে একটা বারান্দার মত। রুদ্র হেঁটে হেঁটে ফাটলটার একদম শেষ প্রান্তে গেল। অন্য চর্তেনগুলোর থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা চর্তেন। রুদ্র সেটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার নিচের দিকের কাঠে হাত বোলাল। একটু হাত বোলাতেই রুদ্র ধরতে পারল ফাটলটা। আস্তে আস্তে চাড় দিতেই বেদির কাঠটা খুলে এল বেশ খানিকটা। ভেতরে একটা গর্ত মতন। তার ভেতরটা হাতড়াতেই রুদ্রর হাতে একটা ধাতব বাক্স ঠেকল। রুদ্র আস্তে আস্তে বাক্সটা টেনে বের করে আনতে লাগল। কাঠের ফাঁকটা আরো একটু বড় করে শেষমেশ রুদ্র বাক্সটা হাতে পেল। তাড়াতাড়ি কাঠটাকে হাত দিয়ে ঠুকে সে আগের মত করে রেখে দিল। বাক্সটা ঢুকিয়ে নিল জ্যাকেটের মধ্যে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শিন লিং কি করছে। শিন লিং তখন সবে মাত্র ব্যাগগুলোকে তোলা শেষ করেছে।

আকাশ কালো করে এসেছে। এখন আরো বেশি বরফ পড়ছে কৈলাস পর্বত জুড়ে। শিন লিং খাওয়ারের প্যাকেট নিয়ে রুদ্রর দিকে এগিয়ে এল, "আকাশের অবস্থা বেশ খারাপ দেখছি স্যর।"

-"কিছুক্ষণ বাদে কেটে যাবে আশা করি। এখনো তো ঘন্টাখানেক আমরা এখানে থাকতেই পারি।"

শিন লিং ঘাড় নাড়ল। খাওয়ারের প্যাকেট রেখে শিন লিং পুজো করতে বসল। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় ফাটলের মধ্যে বরফের কুচি ঢুকে আসছে। তারমধ্যেই শিন লিং ধূপ জ্বেলে স্তুপ আর চর্তেনের সামনে হাত ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছিল। রুদ্রও ওর দেখা দেখি একটা ধূপ জ্বেলে চুপচাপ চোখ বুজে মনে মনে কি যেন প্রার্থনা করল। তারপর পাথরের খাঁজে গুঁজে দিল ধূপটা।

এক ঘন্টা কেটে গেল। রুদ্ররা দুপুরে খাওয়া সেরে নিয়েছে। শিন লিং খাওয়া দাওয়ার পরেও এক প্রস্থ মন্ত্র পড়তে পড়তে চর্তেনগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফাটল বরাবর হাঁটছে। রুদ্র গুটিসুটি মেরে বসে রইল একধারে। এখনো এক রকম ভাবে বরফ পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বাইরে বেরনো সম্ভব নয়। মাঝখানের চত্বরটায় এখন কোমর অবধি বরফ জমে গেছে বোধহয়। শিন লিং-এর জন্য রুদ্র বাক্সটা বের করতেও পারছে না।

একটু পরে শিন লিং একটা বিশেষ চর্তেনের সামনে মন্ত্রোচ্চারন করতে করতে হাঁটু মুড়ে বসল। উঁকি মেরে দেখে নিয়ে রুদ্র আরো একটু পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে বাক্সটা বের করল। বাক্সটা বেশ মজবুত ভাবে তৈরি। ছোট টিফিনবাক্সের মত, আয়তাকার। রুদ্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। বাক্সটা কিভাবে খোলা যায় সে বুঝতে পারছে না। বাক্সের গায়ে সুন্দর করে নক্সা করা, উপরে ছোট ছোট দশটা বলের মত বসানো কিন্তু

চারিদিক থেকেই বন্ধ। রুদ্র চোখ বন্ধ করে ভাবল। বাক্সটার খোলার ব্যাপারে কাঞ্চেন লামা কোন সূত্র দিয়ে গেছেন কিনা। কাঞ্চেন লামার লিপির শেষ শব্দগুলো ছিল আমি কৈলাসের অধীশ্বর। এইটাই কি সূত্র? কে কৈলাসের অধীশ্বর? শিব? কিন্তু বাক্সের গায়ে তো এমন কিছুই নেই যাতে করে শিব কথাটা ব্যবহার করা যায়। রুদ্র ভুরু কুঁচকে বাক্সটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। শিব, শিব। রুদ্র বলগুলোয় আঙুল বুলোতে গিয়েই চমকে উঠল। আরে এগুলোতো বল নয়। বোতামের মত। টিপলে ঢুকে যাচ্ছে। দশটা বোতাম তারমানে শূন্য থেকে নয়। শিব কথাটাকে মনে মনে ইংলিশে পরিবর্তন করে অক্ষর সংখ্যা গুনতে লাগল রুদ্র। A=1, B=2...

সবকিছু যোগ করে যে সংখ্যাটা পেল সেটা বোতামে টিপল রুদ্র। উত্তেজনায় রুদ্রর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাক্স খুলল না। শিব কথাটাকে ওলট পালট করে সংখ্যাগুলোকে ওলট পালট করে বেশ কয়েক বার বোতাম টিপল রুদ্র। কোন কিছুই ঘটল না। চেষ্টা করে করে রুদ্র হতাশ হয়ে পড়ল। বরফ পড়া কমে এসেছে। শিন লিং-ও ধ্যান ভঙ্গের তোড়জোর করছে। রুদ্র জ্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল বাক্সটা। শিন লিং দড়ি দড়া নিয়ে পাহাড় থেকে নামার ব্যবস্থা করতে লাগল। শিন লিং কি এত পুজো করছিল এ কথা মজা করে জিজ্ঞেস করতে। শিন লিং বলল তাদের মন্ত্র একশো আট বার জপ করতে হয় আর চর্তেনগুলোকে একশো আট বার ছুঁয়ে প্রণাম করলে জীবনে সাফল্য আসবেই আসবে। রুদ্র হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একশো আট সংখ্যাটা তার মাথায় আসেনি। হিন্দু বৌদ্ধ দুই ধর্মের কাছেই এটা একটা গুরুত্বপূর্ন সংখ্যা। সে এতটাই ভোঁদা হয়ে গেছে। শিন লিং রুদ্রকে আগে নামতে বলছিল। কিন্তু রুদ্র শিন লিংকে নেমে যেতে বলল। শিন লিং চোখের আড়াল হতেই রুদ্র দ্রুত হাতে বাক্সটা বার করল। একশ আট সংখ্যাটা বোতামে টিপতেই একটা খুট করে আওয়াজ হল। বাক্সের ডালাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। ভেতরে একটা পুরনো দিনের ডায়রী।

শিন লিং নেমে গেছে বেশ খানিকটা। রুদ্র নামছে না দেখে সে দড়িটা নাড়াল বেশ কয়েকবার। প্রত্যুত্তরে দড়ির ঢেউ ফিরে এল। মানে রুদ্র নেমে আসছে। শিন লিং পাদদেশে নেমে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল আরো কিন্তু রুদ্র উপর থেকে নামছে না দেখে শিন লিং অধৈর্য হয়ে উপরে ওঠার তাল করতেই দেখতে পেল রুদ্র দড়ি বেয়ে নেমে আসছে। বরফ পড়া কমে গেছে। আকাশে ছিন্ন মেঘ ভাসছে বটে কিন্তু এখনো মোটামুটি আলো আছে। রুদ্র নেমে আসতে শিন লিং জিজ্ঞাসা করল, এত দেরি কিসের। রুদ্র হাসি মুখে বলল, সেও শিনলিং-এর মত চর্তেনগুলোকে একশ আট বার করে ছুঁয়ে প্রণাম করে এল। দুজনে শিল্‌ং গুম্ফার পথ ধরল। শিল্‌ং গুম্ফা অবধি আসতেই রুদ্রদের সন্ধ্যা হয়ে গেল। সে অন্ধকারে তাদের পক্ষে আর দারচেনে ফেরা সম্ভব নয়। তারা শিল্‌ং গুম্ফায় আশ্রয় নিল। গুম্ফায় মাত্র দুইজন লামা আছেন। তারা একটা ঘরে ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

রাত্রিবেলা হাওয়ায় কখন প্রদীপ নিভে গেছে রুদ্র জানে না। হঠাৎ কি একটা অস্বস্তিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে গেলেও রুদ্রর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে কোন শব্দ করতে বারন করল। ঘরের মধ্যে একটা সরু টর্চের আলো দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার রুদ্রর মুখের উপর দিয়েও ঘুরে গেল। চুপ করে মড়ার মত চোখ বুজে পড়ে রইল রুদ্র। রুদ্রর ব্যাকপ্যাকটা একজন ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ঠুং করে ক্ষীণ একটা ধাতব শব্দ পেয়ে রুদ্র বুঝতে পারল যা খুঁজতে আসা লোকটা তা পেয়ে গেছে। অন্ধকারে রুদ্র বুঝতে পারছে না লোকগুলোর কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা। তবু মরিয়া হয়ে সে ব্যাকপ্যাকের কাছ বসা লোকটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্য লোকটা রুদ্রকে আচমকা লাফিয়ে উঠতে দেখে কিছুক্ষনের জন্য হকচকিয়ে গেছিল। তার মধ্যেই রুদ্র বাক্স চোরের মাথাটা সজোরে দেওয়ালে ঠুকে দিল। অন্য লোকটা একটা ছোট অদ্ভুত অস্ত্র বার

করে তাক করল রুদ্রের দিকে। ঘরের মধ্যে এই সমস্ত হুটোপাটিতে শিন লিং উঠে পড়েছিল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্র হাতে লোকটার উপরে। লোকটার অস্ত্র থেকে কি যেন একটা ধাতব জিনিস ছিটকে গিয়ে গুম্ফার পাথুরে দেওয়ালে আঘাত করল। রুদ্র যাকে চেপে ধরেছিল তার গায়ে প্রচন্ড জোর। সে কিছুক্ষনের মধ্যেই রুদ্রকে ছিটকে ফেলে দিল। পাশের তাক থেকে একটা পিতলের বুদ্ধমূর্তি তুলে নিয়ে রুদ্রর মাথায় আঘাত করল। রুদ্র একটা অস্ফুট শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ততক্ষনে শিন লিং অন্য লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। কিন্তু অন্য লোকটার শক্তির কাছে শিন লিং-ও হার মানল। সেও কিছুক্ষনের মধ্যেই রুদ্রর পাশে মেঝের উপরে ছিটকে পড়ল। চোর দুটো বিনা বাধায় বাক্সটা নিয়ে পালিয়ে গেল।

পরের দিন সকালবেলা শিন লিং কোনমতে রুদ্রকে নিয়ে ফেরত আসল দারচেনে। রুদ্রর অবস্থা দেখে পেমা কাঁদতে শুরু করে দিল। রুদ্র তাকে যত বোঝায় যে সে ঠিক আছে পেমা তত বলে রুদ্রকে সে আর একপাও এগোতে দেবে না। এখান থেকেই রুদ্র নেপালের ফিরে যাবে। তার উপরে পেমা যখন শুনল যে বাক্সটা চোরেরা নিয়ে চলে গেছে তখন তো সে একেবারেই শয্যাগ্রহন করল। দারচেনে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি রুদ্রকে দেখে টেখে ওষুধ দিয়ে কাপড়ের পট্টি খুলে ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেলেন আর পাহাড়ে উঠতে মানা করে গেলেন।

দুপুর নাগাদ ঋতিকা আর চক্রেশ এল। রুদ্রর অবস্থা দেখে দুজনে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। ঋতিকা তো সরাসরি রুদ্রকে চেপে ধরল, "কোথায় ছিলেন কাল আপনি সারাদিন?" রুদ্র বলল যে কালকে তারা শিল্‌ং গুম্ফায় কাঞ্চেন লামার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছিল। কিন্তু পাহাড় থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তার মাথা ফেটে গেছে। এইসব শুনেই চক্রেশ লাফিয়ে উঠল, "দেখেছো তোমাকে বলেছিলাম এদিককার রাস্তা মোটেও ভালো নয়। একজন মাউন্টেনিয়ার পর্যন্ত পড়ে গিয়ে মাথা ফাটাচ্ছে সেখানে আমরা তো পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে মরেই যাব।" সে কিছুতেই আর এগোতে রাজী নয়, কি করে যে রুদ্র এখনো গোঁ ধরে আছে যে সে কৈলাস পরিক্রমন করবে তা তার মাথাতেই ঢুকছে না। ঋতিকার সাথে চক্রেশের ঝগড়া হয়ে গেল। ঋতিকা চক্রেশকে স্পষ্ট বলে দিল যে সে রুদ্রর সাথে কৈলাস পরিক্রমন করবে, চক্রেশ যেতে চাইলে যেতে পারে আর না যেতে চাইলে এই দারচেনেই তাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। চক্রেশ রাগ করে গুম্ফা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ঋতিকা আবার রুদ্রকে চেপে ধরল, "আমি জানি পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়াটা মিথ্যে গল্প। আপনি আমাদের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় আমাকে অন্তত আপনার এবার সব খুলে বলা উচিত।"

ঋতিকার কাছ থেকে আর লুকিয়ে রাখার মানে নেই। রুদ্র তাকে কাঞ্চেন লামার আশীর্বাদ সুতোর লিপি আর সপ্তঋষি গুহার চর্তেনের মধ্যে বাক্সের কথা খুলে বলল। ঋতিকা জিজ্ঞেস করল বাক্সের মধ্যে কি ছিল? একটু দোনামনা করে রুদ্র বলল, "তোমার বিশ্বাস হবে কি না জানি না? বাক্সের মধ্যে একটা ম্যাপ ছিল। ম্যাপটা এই কৈলাস পর্বত আর তার আশে পাশের জায়গার। অদ্ভুতভাবে সেই ম্যাপটায় বলা আছে একটা গোপন দ্বারের কথা। আর সেই দ্বার কৈলাস পর্বতে ঢোকার একটা রাস্তা।"

"কৈলাস পর্বতে? একটা পর্বতের মধ্যে মানুষ ঢুকবে কি করে?"

"আমার মনে হয় কৈলাস পর্বতের পেটের ভেতরটা আসলে ফাঁপা। কোনকালে কোন বিশেষ বুদ্ধিমান সম্প্রদায় এখানে একটা যন্ত্র বসিয়েছিল। আর সেই যন্ত্রকে যাতে কেউ নষ্ট না করতে পারে তার জন্য তারা সেই দরজা চিরকালের মতন বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন যোগী মিরালেপা কোনভাবে সেই দ্বার আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাকে খুলে কৈলাসের অন্তঃস্থলে ঢুকে ছিলেন। কিন্তু তিনি সেই দ্বারকে আগের মত সম্পূর্নভাবে বন্ধ করতে পারেননি। তার হয়ত আরো কয়েকবার ঢোকার ইচ্ছা ছিল। মিরালেপা মারা যাওয়ার

আগে এক বিশেষ পুঁথিতে লিখে রেখে গেছিলেন তার এই বক্তব্য। এমনকি তিনি সেই গুপ্তদ্বারের হদিসও দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পরবর্তী লামাদের কাছে সেই দ্বার বন্ধ করার আকুতি জানিয়ে গেছেন। কাঞ্চেন লামা শুনেছিলেন এই গুপ্তপুঁথির কথা। তিনি জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন এই পুঁথির খোঁজে। অবশেষে কৈলাস পার করে আরো উত্তর তীব্বতের ভয়ংকর মালভূমিতে তিনি এক অতি প্রাচীন গুম্ফার সন্ধান পান। সেইদিকে হয়ত গত তিন চারশো বছর কোন মানুষের পা পড়েনি। কাঞ্চেন লামা সেই পুঁথির পাঠোদ্ধার করেন এবং তার সাহায্যে বছর প্রায় বছর পাঁচেক আগে এই গুপ্তদ্বার খুঁজে বের করেন।" – রুদ্র দম নেবার জন্য একটু থামল।

পেমা বিড়বিড় করে বলে উঠল, "এই জন্য পাঁচ বছর আগে মাস্টার একবার প্রায় বছর খানেকের জন্য কোথায় চলে গিয়েছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম উনি হয়ত লাসায় গিয়েছেন। কিন্তু উনি তখন মহাযোগী মিরালেপার পুঁথির সন্ধানে গেছিলেন।"

রুদ্র আবার বলতে শুরু করল- "পাঁচ বছর ধরে সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু গত বছর শীতকালে এই অঞ্চলে তীব্র সৌরঝঞ্ঝা আঘাত করে। যার জন্য এখানকার সমস্ত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু এখানে মানুষের বসবাস কম, তাই বৈদ্যুতিক জিনিস ব্যবহারের প্রচলনও কম। তাই ব্যাপারটা কেউ সেভাবে ধরতে পারে নি। কিন্তু কাঞ্চেন লামা এটা বুঝতে পেরেছিলেন। কারন সেই গুপ্ত দ্বারের অন্তরালে যে যন্ত্র ছিল তাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাজার বছর ধরে যে যন্ত্র কাজ করে চলেছে তার হঠাৎ করে কাজ করা বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে কোন যুক্তিই ছিল না। তাই তিনি গোপালাচারীকে পত্র পাঠান। সেই সময় আমি গোপালাচারীর সাথেই ছিলাম। কিন্তু তখন উনি আমাকে কাঞ্চেন লামার ব্যাপারে খুলে কিছুই বলেন নি। শুধু বলেছিলেন যে ওর এক বন্ধু তিব্বত রিজিয়নে কিছু ইলেকট্রনিক্সের কাজ করে তার জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। হয়ত কাঞ্চেন লামাও তাঁকে তাই বলেছিলেন। তারপরে গোপালাচারী নাসায় কাজ করা তার এক চেনা বন্ধুকে সৌরঝঞ্ঝার খবর জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে যে গোপালাচারী ঠিকই আন্দাজ করেছে যে একটা বড়সড় সৌরঝঞ্ঝা তিব্বতের উপরে আঘাত করেছে। কিন্তু নাসা এখনো এই ব্যাপারে কিছু জনসাধারনকে কিছু বলতে রাজী নয়। কারন নাসার মতে এত বড় সৌরঝঞ্ঝার প্রকোপে এর আগে পৃথিবী কখনো পড়েনি। এর ফলে অন্য কোন বড় ধরনের সমস্যা তৈরী হয়েছে কিনা তা না জেনে নাসা কখনোই এই ঘটনা সাধারনের কাছে বলবে না।" – এই অবধি বলে রুদ্র থেমে গেল। ঋতিকা হাঁ হাঁ করে উঠল, "তারপর তারপর।"

"একটু জল খাই।" রুদ্র কটমট করে তাকাল ঋতিকার দিকে। পেমা উঠে গিয়ে একটা বোতল এনে দিল। জল খেয়ে, পিঠের কাছে বালিশটা ঠিক করে রুদ্র হেলান দিয়ে আবার বলতে শুরু করল।

"আমি কাঞ্চেন লামার ডাইরীতে পাই যে, কাঞ্চেন লামা ধৈর্য ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে খুঁজে বার করেছিলেন যে অত বিশাল যন্ত্রের কোথায় গোলমাল। তারপর তিনি সেই সার্কিট বোর্ডগুলোর আদলে নকশা বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন গোপালাচারীর কাছে। এই অভাবনীয় যন্ত্র নিয়ে কাঞ্চেন লামার চিন্তার শেষ ছিল না। এই যন্ত্রটা খারাপ মানুষের হাতে পড়লে যে অনেক কিছুই হতে পারে তা তিনি জানতেন। তাই তিনি গোপালাচারীকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে কিছু কিছু খবর জানাতেন। মানুষ ভাবত যে তিনি কাউকে আশীর্বাদক সুতো পাঠাচ্ছেন। কিন্তু যখন অনেক অনেক ছবি আর সার্কিটের ডায়াগ্রামের ব্যাপার এল তখন আর সেই গোপনীয় পদ্ধতিতে জিনিস পাঠান গেল না। তখন তিনি পেমাকে পাঠালেন। তিনি পেমাকে নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করতেন। তিনি জানতেন ঐ কাগজের বান্ডিল গোপালাচারীর হাতে না তুলে দিয়ে পেমা বিশ্রাম নেবে না। গোপালাচারী যন্ত্রের ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানতেন না। কাঞ্চেন লামাও তাকে বলেনি। কিন্তু তিনি কাঞ্চেন লামাকে অবিশ্বাস করেননি। তিনি যেরকম চেয়েছেন সেরকম সার্কিট বোর্ড তৈরীর জিনিসপত্র তিনি

নিয়ে এসেছিলেন। কিভাবে সেই জিনিসটা পুরোপুরি তৈরী করা যায় তাও তিনি বলে গিয়েছিলেন নিজের বিপদ বুঝে। তারপরে আপনি তো জানেনই।"

"কিন্তু কি সেই যন্ত্র? তার কাজটা কি?" অধৈর্য হয়ে ঋতিকা আর পেমা প্রায় একসাথে প্রশ্ন করল।

"যন্ত্রটি একটি ভূমিকম্প নিরোধক যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে হিমালয়ের এই দীর্ঘ ফল্ট লাইনের ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রিত হয়। এর সাহায্যে আগে থেকে জানাও যায় কোথায় ভূমিকম্প হবে। এই যন্ত্রটার জন্যই ভারত সেরকমভাবে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় না। অথচ ভূ তাত্বিকদের হিসাবে সেটাই হওয়া উচিত ছিল। কাঞ্চেন লামার মতে বহু পূর্বে পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশি ভূমিকম্প প্রবন এলাকা ছিল আমাদের এই ভারত ভূখন্ড। এখন যদিও ভারত একা নয়। নেপাল, ভুটান আর তিব্বতও এর মধ্যে আছে। সে যাই হোক। সেই প্রাচীন বুদ্ধিমান প্রজাতি তাদের বাসস্থানকে ঠিক রাখার জন্য এমন এক যন্ত্রের আবিষ্কার করে যা মারাত্মক ভূমিকম্পকে অনেক মৃদু করে তুলতে পারে। কাঞ্চেন লামার মতে ১০ মাত্রার ভূমিকম্পকে সে ৮ মাত্রায় নামিয়ে আনতে পারে।"

ঋতিকা অবাক হয়ে বলল, "এ তো অসম্ভব কথা।"

"অসম্ভব কথা বলেই জিনিসটা লুকিয়ে রাখার এত প্রয়োজন। আর কাঞ্চেন লামা এমনটাও বলে গেছেন তার ডায়রীতে যে ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে কৃত্রিমভাবে ভূমিকম্প তৈরি করাও সম্ভব। যতদূর সম্ভব যোগী মিরেলেপা তিব্বতকে বাঁচানোর জন্য যন্ত্রটির সাহায্যে কৃত্রিম ভূমিকম্প তৈরি করতেন যখনই বিদেশীরা এই ভূমিতে ঢোকার চেষ্টা করত। এই জন্যই বোধহয় আগেকার মানুষদের মনে ধারনা জন্মেছিল যে লামাদের অনুমতি ছাড়া তিব্বতে প্রবেশ করা যায় না।"

"এ তো আরো মারাত্মক কথা রুদ্র। কিন্তু আমাদের এখন তাহলে কি করা উচিত?" – ঋতিকা পুরো ব্যাপারটার গুরুত্ব ভালো করেই বুঝতে পারছিল। এরকম একটা যন্ত্রের কথা যদি পৃথিবীতে ফাঁস হয়ে যায় তাহলে দেশে দেশে যুদ্ধ পর্যন্ত শুরু হয়ে যেতে পারে। আর কোন খারাপ লোকের হাতে পড়লে সে তো বিভিন্ন দেশকে ব্ল্যাকমেইল পর্যন্ত করতে পারে।

"আমাদের কর্তব্যটা খুবই সাধারন, প্রথমতঃ যন্ত্রটিকে সারিয়ে তোলা। যাতে করে সে আবার ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রন করতে পারে। আর দ্বিতীয়ত সেই দ্বারকে বন্ধ করে দেওয়া যাতে করে কেউ আর তার সন্ধান না পায়। কাঞ্চেন লামার কথা অনুযায়ী ঐ দ্বার খোলা থাকার ফলেই সৌরঝঞ্ঝা যন্ত্রটাকে বিকল করতে পেরেছে। দ্বার ঠিক মত বন্ধ করে দিলে যে কোন জাগতিক বা মহাজাগতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করবে।" – কথা শেষ করে রুদ্র একটু জল চাইল। ঋতিকা বোতলটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "কিন্তু ঐ দ্বার খুঁজে পাওয়া যাবে কি করে?"

"ম্যাপটা ঐ সপ্তর্ষি গুহাতে একটা বাক্সে রেখে গেছিলেন কাঞ্চেন লামা। সেই বাক্সটাই কাল রাতে সিলুং গুম্ফা থেকে চোরে চুরি করেছে আর আমার এই হাল করেছে।"

ঋতিকা আর পেমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এত কষ্ট স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত কিনা তীরে এসে তরী ডুবল। রুদ্র ওদেরকে দেখল ভালো করে, তারপরে পেমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কালকে কৈলাস পরিক্রমার জন্য মালবাহক আর ঘোড়া ঠিক করেছিস?"

পেমা মুখ ভারী করে জবাব দিল, তার কি আর কোন দরকার আছে? ম্যাপই যখন নেই তখন আর কি দরকার ঐ রাস্তায় গিয়ে? তার থেকে বরং রুদ্র কালকের দিনটা দারচেনে বিশ্রাম করে পরশু নেপাল ফিরে যাক। ডাক্তার তাকে এরকম আঘাত নিয়ে ঐ রাস্তায় যেতে বারন করেছে।

ঋতিকার প্রায় চোখে জল এসে যায় আর কী! রুদ্র ওদের অবস্থা দেখে মিটিমিটি হাসল, "ম্যাপ নেই তোকে এ কথা কে বলল পেমা?"

পেমা অবাক হয়ে তাকাল রুদ্রর দিকে, "এই যে তুমি বললে, ম্যাপ চুরি গেছে!"

রুদ্র বলল, "আমি বললাম যে বাক্সটা চুরি গেছে।"

ঋতিকা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, "আর ম্যাপ?"

"আছে"- শান্ত স্বরে বলল রুদ্র।

"কোথায় আছে? দেখাও আমাদের।"

"দেখানো যাবে না। আমি ঐ ম্যাপ দেখে মুখস্থ করে নষ্ট করে ফেলেছি।"- রুদ্র মাথায় টোকা দিল তর্জনী দিয়ে, "ওরকম জিনিস সাথে নিয়ে ঘুরব এত বোকা আমি নই। যেখানে আমাদের আশে পাশেই শত্রুরাও আছে। ঐ গুপ্তদ্বারের সন্ধান এখন আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।"

ঋতিকা আর পেমা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষন উত্তেজনায় ওরা দম আটকে বসেছিল। দু'জনেই উঠে পড়ল। ওদের উঠতে দেখে রুদ্র অবাক হল, "কি হল?"

ঋতিকা হাত নাড়াল, "যাই দেখি গে, আরেকজন রাগ করে চলে গেল। তাকে মানাই এখন। আপনি বিশ্রাম করুন।"

রুদ্রর কি মনে হতে সে চট করে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কালকে চক্রেশ কি কোথাও গিয়েছিল নাকি সারাদিন এখানেই ছিল?"

"ও তো এখানেই ছিল। পেমার সাথে ঘুরে ঘুরে মালবাহক আর ঘোড়া ঠিক করছিল। কেন বলুন তো?" ঋতিকা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রুদ্রর দিকে।

"না কিছু নয়। রাত্তিরেও?" বিছানায় গা এলাতে এলাতে রুদ্র জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ রাত্তিরেও। রাত্তিরে কোথায় যাবে আবার? কি ব্যাপার আপনি আবার ওকে সন্দেহ করছেন নাকি?"

"না না এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। আর আপনি তো বললেনই যে ও এখানেই ছিল। যাক এখন একটু রেস্ট নিই। মাথাটা ভার ভার লাগছে। কাল থেকে অনেক কাজ আছে।" রুদ্র শুয়ে পড়ে লেপটা টেনে নিল।

ঋতিকা গুম্ফা থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

।। চার।।

পরের দিন সকাল সকাল সবাই অন্য একটা গাড়ী করে তারপোচেতে হাজির। দারচেন থেকে তারপোচে গাড়ীতে আধ ঘন্টার বেশী লাগে না। রুদ্রদের গাড়ীর ড্রাইভার শিন লিং রুদ্রদের সাথেই যাবে কৈলাস পরিক্রমায়। আগে সে এই অঞ্চলেই গাইডের কাজ করত। পরে ড্রাইভিং শিখে ন্যালম থেকে দারচেন পর্যন্ত গাড়ী চালায়। শিন লিং থাকাতে রুদ্রদের খুব সুবিধা হয়েছে। তাদের আর আলাদা করে গাইড নিতে হচ্ছে না। তারা যে কাজে যাচ্ছে সেই কাজের খবর বেশি লোককে না জানানোই ভালো। এমনিতেই কৈলাস পর্বতে ওঠা বারন বলে কেউই আর পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিশেষ যায় না। তাও সপ্তঋষি গুহায় অনেকে যায় বলে এদিকের রাস্তা শেরপা গাইডদের চেনা। কিন্তু কৈলাসের উত্তর পাদদেশে কেউ যায় না বলে ওদিকের রাস্তা গাইডদেরও জানা নেই।

তারপোচে থেকে তিনজন মালবাহক, দুটো ইয়াক আর একটা ঘোড়া নিয়ে পাঁচজনে রওনা হল কৈলাস পরিক্রমনের প্রথম গন্তব্য দিরাপুক গুম্ফার দিকে। শেষমেশ চক্রেশ ঋতিকাকে একা ছাড়েনি, সেও এসেছে সঙ্গে। এত পথ হাঁটা ঋতিকা বা চক্রেশ কারোরই অভ্যেস নেই। তার উপর রুদ্রও আহত। যদিও সে বিন্দুমাত্র স্বীকার করছে না তার শারীরিক ক্লেশের কথা। তবুও একটা ঘোড়া নিয়েই নেওয়া হল শেষ পর্যন্ত। ঋতিকা

প্রথমে বেশ কিছুটা পথ ঘোড়ার পিঠে যাবে। বাকিরা হেঁটে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। অনেকেই হেঁটে যাচ্ছে একই পথ ধরে। ঘোড়া ছুটিয়ে তিব্বতীরাও মাঝে মাঝে পেরোচ্ছে যাত্রীদের।

দারচেন গুম্ফা ছাড়ার একটু পরেই একটা নদী সঙ্গ নিয়েছে রুদ্রদের। গভীরতা নেই কিন্তু স্রোত তীব্র। নীল জলে নুড়ির আঘাতে সাদা ফেনা তৈরি হচ্ছে আবার মিলিয়েও যাচ্ছে সাথে সাথে। হিমবাহগলা জলে হাত লাগালেই কনকনে ঠান্ডা। কিন্তু দীর্ঘক্ষন হাঁটার ক্লান্তিতে মাঝে মাঝেই সেই নদীর ঠান্ডা জলে মন জুড়োতে ইচ্ছা করে। কিছুক্ষনের মধ্যেই ওরা বিখ্যাত লা চু গ্লেসিয়ার ভ্যালিতে ঢুকে পড়ল। বরফ গলে যাওয়া ভ্যালিটা এখন কাঁকরে ভর্তি। ঢালু পথ বেয়ে ওরা উঠতে থাকল। চতুর্দিকে ছোট বড় ধারালো পাথরের টুকরো। ঋতিকা ঘোড়ার পিঠে বসে বসে তার ভৌগলিক পাথুরে জ্ঞান উজার করে দিতে লাগল। রাস্তাটা বেশ কষ্টকর চক্রেশের পক্ষে। তার এর আগে এরকম পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটার কোন অভিজ্ঞতা নেই। বিশেষতঃ তারা এখন প্রায় চারহাজার আটশো মিটারের কাছে উঠে এসেছে। হাওয়াতে অক্সিজেন যথেষ্ট কম। ঘোড়ার পিঠে থেকেও মাঝে মাঝে ঋতিকার হাঁফ ধরছিল। আরো ঘন্টাখানেক যাওয়ার পর ওরা বিস্তীর্ন ঘাসে ভরা মাঠ পেল। দুপাশে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। এখানেই কোথাও একটা চুকু গুম্ফা। নদী পেরিয়ে পাশের পাহাড়ে। সেদিকে গেল না রুদ্ররা। তারা কৈলাসের পাশ ধরেই হাঁটতে থাকল।

মাঝখানে একটা জায়গায় ওরা বিশ্রাম নিতে বসল। এরপরে ঋতিকা হেঁটে যাবে আর চক্রেশ ঘোড়াতে। রুদ্র বলল পরের দিন তারা যে রাস্তায় ঢুকবে সেখানে ঘোড়া যাবে না। তাই ঋতিকার কিছুক্ষণ হাঁটা অভ্যাস করা উচিত। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে কৈলাসের পাদদেশটা উঁকি মারছিল। পশ্চিমে আরেকটা পাহাড়ের একদম উপর থেকে সরু ঝর্না নেমে আসতে দেখল ঋতিকা। শারীরিক অস্বস্তির থেকেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তার মন ডুবে যাচ্ছিল ক্রমাগত। তার মাঝেই পরের দিন কি হবে সেটা ভাবলেই ঐ পাহাড়ি নদীর মতই একটা চিনচিনে স্রোত বারে বারে তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছিল।

প্রায় বেলা বারোটার সময় ওরা দ্রিরাপুক গুম্ফায় যাওয়ার সেতুর কাছে এসে পৌঁছাল। শিন লিং অনেক আগেই এখানে পৌঁছে তাদের জন্য দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। নুডলসের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে ঋতিকা দেখল অনেকেই পাহাড়ী নদীর সেতু পার হয়ে দ্রিরাপুক গুম্ফার দিকে চলে যাচ্ছে। তারা সেখানে গেস্টহাউসে রাত কাটাবে। কিন্তু শিন লিং সেদিকে গেল না। মালবাহকদের সাথে কীসব কথা বলে তারা কাঁকুরে পায়ে হাঁটা পথ ধরে এগিয়ে চলল। দ্রিরাপুক গুম্ফা থেকে দুটো পাহাড়ি ভ্যালির মধ্যে দিয়ে আকাশচুম্বী কৈলাসের উত্তর মুখ দেখতে পাওয়া যায়। এই দিকের পাহাড়ের ঢালটা কেমন খাপছাড়া গোছের। পাহাড়ের মাঝখানে অনুভূমিক ভাবে কেউ যেন কুড়ল দিয়ে কেটে খানিকটা বরফ পাথর তুলে নিয়েছে পাহাড়ের গা থেকে। শিন লিং-রা চলে যাওয়ার প্রায় আধঘন্টা বাদে রুদ্ররা ঐ ভ্যালি দিয়ে কৈলাসের দিকে হাঁটা শুরু করল। সেতুর কাছেই ঋতিকা আবার ঘোড়ায় চেপেছে। রুদ্রকে বলা হয়েছিল। সে শোনেনি। বরং ঋতিকাকে বলেছে একদিনে বেশি হাঁটলে কাল আর পাহাড়ে চড়ার ক্ষমতা থাকবে না। ঋতিকা বেশি চাপাচাপি করেনি। তার শরীর সত্যি খুব একটা ভালো নেই।

ভ্যালি বরাবর প্রায় দু'ঘন্টা ওদের ক্রমাগত পাহাড়ে উঠতে হল। ওদের সাথে সাথে একটা সরু পাহাড়ী ঝোরা বয়ে যাচ্ছিল। একটু পর থেকেই রাস্তায় বরফ শুরু হল। কিন্তু তা খুব বেশী গভীর নয়। চক্রেশ বারবার পিছিয়ে পড়ছিল। এই রাস্তায় তেমন লোকের আনাগোনা নেই বলে পেমা মাঝে মাঝেই ওর জন্য দাঁড়িয়ে থাকছিল। যদিও রাস্তায় অসংখ্য ছোট ছোট পাথরের স্তুপ আর তিব্বতীদের রংবেরঙের পতাকা পোঁতা ছিল। তবুও আলো ফুরিয়ে আসছে, যদি রাস্তা ভুল হয় বলে পেমা প্রায়ই দাঁড়িয়ে পড়ছিল চক্রেশের জন্য। দ্রিরাপুক সেতুর কাছে ওরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন শিন লিং মালবাহক আর ইয়াকদের নিয়ে এগিয়ে গেছে। ওরা জানত গ্লেসিয়ার অবধি পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সেইজন্য ওরা আগে ভাগে এগিয়ে গেছে তাঁবু খাটাবার

জায়গা খুঁজতে। দিনের আলো প্রায় মুছে যাওয়ার সময়ে ওরা এসে দাঁড়াল বিখ্যাত ক্যাংকাম বা গ্যাংজাম গ্লেসিয়ারের সামনে। দু পাশে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে পাহাড় মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর আর বজ্রপাণি। আর সামনে আকাশ ভেদ করে খাড়া উঠে গেছে কৈলাস পর্বত। বিশাল কালো পাথরের উপর বরফের আস্তরন। সূর্যের শেষ আলোয় কৈলাস পর্বতকে দেখে ঋতিকার বুক কেঁপে উঠল ভয়ে না ভক্তিতে তা সে নিজেও বুঝতে পারল না। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সে একটা লম্বা প্রণাম করল শৃঙ্গটিকে। "হে ভগবান তোমার আশ্রয়ে এসেছি। আমাদের ব্যর্থ করো না।" শিন লিং ভালো জায়গা বেছে তিনটে তাঁবু খাটিয়ে ফেলছে। রুদ্রর ছোট তাঁবুটায় ঋতিকা একলা থাকবে। আর একটা তাঁবুতে রুদ্র, পেমা, শিন লিং আর চক্রেশ। আর অন্যটায় মালবাহকরা থাকবে আর রান্নাও হবে। যদিও পরের দিন রুদ্র বলেছে একজন মালবাহক ছেড়ে বাকিদের ছুটি দিয়ে দেবে। এখানে আশে পাশে বরফের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে। পাহাড়ী ঝোরাটাও জমাট বেঁধে গেছে বলে তার আওয়াজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। সামনে বিস্তীর্ন বরফ ঢাকা মাঠ। মাঝে মাঝে কালো পাথর মাথা তুলে আছে।

শিনলিং ওদের জন্য গরম ধোঁয়া ওঠা কফির মগ নিয়ে এল। তখনও সম্পূর্ন অন্ধকার হয়নি চারিদিক। কৈলাসের উপর অদ্ভুত আলোর খেলা দেখতে দেখতে ঋতিকা তন্ময় হয়ে পড়েছিল। শিন লিং আর রুদ্রর কথায় চটকা ভাঙ্গল। পেমা আর চক্রেশ তখনও এসে পৌঁছায়নি। চক্রেশকে প্রায় এক ঘন্টা যাবদ দেখেনি ঋতিকা। তার ঘোড়া দলের আগে আগেই চলছিল। যতবার বাঁক বা কিছু এসেছে সে পিছন ফিরে রুদ্রকে দেখতে পেয়েছে। এখন শিন লিং-এর কথা শুনে ঋতিকার কফি খাওয়া মাথায় উঠলো, "সে কি চক্রেশ কোথায় মাথা ঘুরে পড়ে টরে যায়নি তো? ওর তো কখন থেকেই হাঁপ ধরছিল?"

শিন লিং ঋতিকার কথা একেবারে ফেলে দিতে পারল না। সে রুদ্রকে তাঁবুর দায়িত্বে রেখে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে দেখতে গেল একটা বড় টর্চ নিয়ে। অন্ধকার হয়ে গেলে এসব রাস্তায় পথ চলা খুব মুশকিল। দিনের আলোতেই ছড়ানো পাথর আর কাকঁরে ঘন ঘন হোঁচট আর পা হড়কাচ্ছিল ঋতিকার। সেখানে অন্ধকারে চক্রেশ কি করে তাঁবুতে এসে পৌঁছবে তা তার মাথাতেই ঢুকল না। এ তো আর কলকাতার রাস্তা নয় যে রাস্তার ধারে আলো উপচে পড়ছে। এখানে সূর্যের আলো না থাকা মানে চির অন্ধকারের রাজত্ব। আর চাঁদ না উঠলে সে অন্ধকার এতই নিকষ যে কখনো কখনো পাশের মানুষটাকে পর্যন্ত দেখা যায় না। এ এক অদ্ভুত শুন্য জায়গা। এখানে এসে অবধি ঋতিকা একটাও পাখির ডাক শোনেনি। চমরী আর ঘোড়া ছাড়া দেখেনি কোন বড় জীবজন্তু। শুনেছে হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে নাকি ভালুক আর তুষারচিতা থাকে। যদি শিন লিং ওদের খুঁজে না পায়? যদি চক্রেশ কোথাও অজ্ঞান হয়ে যায়? সারা রাত এই ঠাণ্ডায় ওরা যদি খোলা আকাশের নিচে থাকে তাহলে আর হিংস্র জন্তুর দরকার হবে না এমনিই জমে গিয়ে মারা যাবে। উৎকণ্ঠায় ঋতিকা আর থাকতে পারল না। সেও ব্যাগ থেকে একটা টর্চ বের করে দ্রিরাপুক গুম্ফার দিকে যাবে ঠিক করল।

"এ কি টর্চ নিয়ে কোথায় চললেন আপনি?" তাঁবুর ভেতরে সব গোছগাছ করে বাইরে এসে ঋতিকাকে দেখে রুদ্র অবাক হয়ে গেলো।

"ওরা তো এখনো ফিরল না?"

"শিন লিং আর পেমা দুজনেই আছে। দুজনে পাহাড়ী ছেলে। শিন লিং তো এখানকার গাইডও ছিল। আপনার এতো ভয় পাওয়ার মত কিছুই ঘটেনি। চক্রেশ যদি অসুস্থও হয়ে পরে তাহলেও ওরা ওকে বয়ে নিয়ে আসবে ঠিক। আপনি বরং এখন তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ুন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে। তখন আরেক মুশকিল।"

ঋতিকার তাঁবুতে একটা হ্যাজাক আলো জ্বেলে, বিছানা তৈরি করে, স্লিপিং ব্যাগের খোলা পরা বুঝিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই রুদ্র দূরে টর্চের আলো দেখতে পেল। তিনজনে ফিরে আসছে। রাঁধুনীর তাঁবুতে চা বানাতে বলে রুদ্র এগিয়ে গেল ওদের দিকে। চক্রেশ সত্যি সত্যি বড় বিপদে পড়েছিল। এতটা রাস্তা সে আগে হাঁটেনি। তাই শেষের দিকে সে আর তাল রাখতে পারছিল না। ক্লান্ত হয়ে বার বার বসে পড়ছিল। একটা জায়গায় সে পাথরের গায়ে ঠেসান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল হঠাত উপর থেকে ঝুর ঝুর করে কিছু বালি তার মাথার উপরে পড়ে। তক্ষুনি সে সরে গিয়েছিল ভাগ্যিস নয়তো এতক্ষনে সে সোজা কৈলাস অধিপতির কাছে মানে স্বর্গে পৌঁছে যেত। চক্রেশ সরে যেতেই উপর থেকে একটা বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে। তারপর সেই বড় পাথরের ধাক্কায় আরো ছোট বড় অনেকগুলো পাথর গড়িয়ে পরে। তারই মধ্যে একটা এসে চক্রেশের কাঁধের কাছে লেগেছে। পেমার ধারনা পাথরগুলো এমনিই গড়িয়ে পড়েছে। আর চক্রেশের ধারনা কেউ তার পিছনে লেগেছে। সে সরাসরি জিজ্ঞেস করল রুদ্রকে যে কেন তারা এখানে এসেছে না বললে সে তো আর কোথাও যাবেও না, ঋতিকাকেও একপাও এগোতে দেবে না। রুদ্র ভুরু কুঁচকে ভাবল খানিকক্ষণ। লোকগুলো যে পিছু ছাড়েনি বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তারা চক্রেশকে মারতে চাইছে কেন? রুদ্রকে আক্কেল দেয়ার জন্য? শেষমেশ রুদ্র চক্রেশকে খানিকটা রেখে ঢেকে বলল যে কাঞ্চেন লামা তাদের একটা যন্ত্র সারাবার দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু যন্ত্রটা কোথায় আছে তা রুদ্র জানে না। তাই সে গ্যাংজাম গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে গিয়ে কৈলাসের পাদদেশ বরাবর সে খুঁজে দেখতে চায় কোথাও যন্ত্রটা রাখা আছে কিনা। চক্রেশ একটু অবাক হল। বলল, কি রকম যন্ত্র সেটা? রুদ্র কথা বাড়াল না, শুধু বলল, লামা কিছুই বলে যেতে পারেনি তুমি তো জানোই যে আমরা আসার আগেই সে মারা গেছে। চক্রেশের মুখ দেখে মনে হল সে রুদ্রর কথা ঠিক বিশ্বাস করল না। তবে আর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে সে নিজের স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গেল।

পরের দিন ভোর ভোর উঠে বেরোতে হবে। শিনলিং আর রুদ্র আগে বেরোবে। ওরা যদি কোন রাস্তা খুঁজে পায় তাহলে শিনলিং ফিরে আসবে। তারপরে পেমা, ঋতিকা আর চক্রেশ যাবে যন্ত্রাংশটা নিয়ে। বিশেষ করে ঋতিকার যাওয়াটা জরুরী। ও না গেলে যন্ত্রটা ঠিক কে করবে।

কথামতো ভোরবেলা রুদ্ররা বেরিয়ে গেল। দুজন মালবাহককে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরেকজন রান্নাবান্নার জন্য শুকনো ডালপালার খোঁজে পেমাকে নিয়ে গেছে। চক্রেশ ছেলেদের তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঋতিকা তাঁবুর চেনটা টেনে দরজা বন্ধ করে ব্যাগটা কোলের কাছে নিয়ে বসল। সে এই কদিন একা থাকতে পারেনি একটুও। সবসময়ই চক্রেশ তার সাথে সাথে আছে। ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কাপড়ে মোড়া ছোটখাটো বই বার করল ঋতিকা। বইটার মধ্যের পাতা কেটে সে লুকিয়ে রেখেছে শিশিটাকে। কাউকে বলেনি এখনো পর্যন্ত। বিদেশী লামা কি বলে গিয়েছিল? কাউকে বিশ্বাস না করতে। কিসে যে দরকার লাগবে এই শিশির তরলটা সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না ঋতিকা। তবে আগে তো রুদ্ররা দ্বারটা খুঁজে বার করুক। তা যদি না পারে তাহলে বুঝতে হবে পুরোটাই একটা অলীক স্বপ্নের পিছনে ছুটে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। তা যদি অলীক স্বপ্নও হয়ে থাকে সেই যন্ত্র তাতেও ঋতিকার আপত্তির কিছু নেই। সে এরকম ভ্রমন এর আগে কখনো করেনি। মানস সরোবর ভ্রমন, কৈলাস পর্বতের কোলের কাছে শুয়ে থাকা এ তার মত মেয়ের কাছে অচিন্ত্যনীয় প্রায়। পাথরের উপর কার পায়ের শব্দ শুনে ঋতিকা শিশিটা বইয়ের মধ্যে পুরে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল। চেইনটা খুলে দেখল চক্রেশ আসছে।

গল্পে গল্পে কত বেলা হয়ে গেছে খেয়াল করেনি ঋতিকারা। পেমা আর পাহাড়ী ছেলেটা মিলে রান্নাবান্নার কাজ করছে। চড়া রোদ উঠতেই কালকের বরফ হয়ে যাওয়া নদীটা গলে গিয়ে আবার বইতে শুরু করেছে। একসময় ওরা খেয়ে নিল। কোন কাজ নেই ওদের যতক্ষণ না রুদ্র আর শিন লিং ফিরে আসছে।

সূর্যের আলো সবে নরম হতে শুরু করেছে। ঋতিকা ঘুমিয়ে পড়েছিল, পেমার ডাকে তার ঘুম ভাঙ্গল। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল রুদ্ররা এসে গেছে। ও আকুল আগ্রহ নিয়ে রুদ্রের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু রুদ্রই হাত নেড়ে বলল, প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে। আগে খাওয়া পরে কথা। খেতে খেতে শিন লিংই বলে দিল যে ওরকম কোন গেট খুঁজে পাওয়া যায় নি। রুদ্রর মুখ দেখেও তাই মনে হল। ঋতিকা এতোটাই হতাশ হল যে তার আর বসে থাকতে ভালো লাগল না। নিজের তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। এত কষ্টের কোন মূল্যই রইল না তাহলে? তাহলে কোন যন্ত্রের আদলে ঐ সার্কিট এঁকেছিল বিদেশী লামা? একটু পরে রুদ্র এল ঋতিকার তাঁবুতে।

"খুব হতাশ হয়েছেন মনে হচ্ছে?"

"না না হতাশের কি আছে? আজ পাননি কাল নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন। পুরো পাদদেশটা তো আজকে দেখে ফেলেন নি।" ঋতিকা গলার স্বরে আশা রাখতে চেষ্টা করল।

"নাহ। ম্যাপে যে জায়গা অবধি রাস্তা দেওয়া আছে আমরা তত অবধিই গেছিলাম। কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। অথচ কাঞ্চেন লামার ডাইরীতে স্পষ্ট বলা আছে যে সোনার দ্বার আছে সেখানে।" রুদ্র মাথা নাড়ল।

"সোনার দ্বার? এই বরফের রাজত্বে? আপনি একথা বিশ্বাস করলেন কি ভাবে?"

"মানে আপনি কি বলতে চাইছেন?"- রুদ্রর কৌতূহলী হল।

"দেখুন সাধারন মানুষ এখানে না আসতে পারে কিন্তু তিব্বতীদের এই জায়গাটা চষা। এমনকি এতোটা ভেতরেও আমি পাহাড়ের গায়ে ওম মনিপদ্মে হুম লেখাটা দেখেছি। তার মানে এখানে যদি কিছু থেকে থাকে। কোন দরজা বা যন্ত্র তা নিশ্চয়ই এমনভাবে রাখা আছে যা কারোর চোখে পড়ছে না।"

"এটা তো আপনি ঠিক কথা বলেছেন। আমিই বোকার মত সোনার দরজা খুঁজছি। সোনার দরজা কথাটার হয়ত অন্য কোন মানে আছে।"

"এগজ্যাক্টলি। আচ্ছা আপনি যে ম্যাপ অনুসারে গেছিলেন সেটা কোথায়?"

"সেখানে কিছুই নেই। বড় বড় পাথর শুধু। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। এই ধরুন আপনাকে ঘন্টাদেড়েক যেতে হবে।"

"আচ্ছা কাল একবার সেখানে যাওয়া যায়?"

"সে তো যাবোই এতটা রাস্তা কি এমনি এলুম।"

"তাহলে আমি যেতে চাই আপনার সাথে। আর আমি একলা যেতে চাই।"

"কি ব্যাপার বলুন তো?"

"আপনি যেমন অনেক কথা বলেননি আমাকে তেমনি ধরে নিন এটা আমার গুপ্তকথা। তাহলে কাল সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কখন বেরোন যাবে?"

রুদ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ঋতিকার দিকে। "তা হলে ভোরবেলাই বেরতে হবে। কেউ জেগে ওঠার আগেই।"

"ঠিক আছে।"

"কিন্তু সূর্য ওঠার আগে অন্ধকারে এই বরফের উপর দিয়ে হাঁটা, এ কি সম্ভব হবে আপনার পক্ষে?" রুদ্র সামান্য চিন্তিত স্বরে বলল।

"আপনি থাকবেন তো সাথে। অসুবিধা হবে না। আর তাছাড়া আপনার কাছে টর্চও আছে। কিন্তু আমি কাউকেই জানাতে চাই না। চক্রেশকেও নয়। অন্ধকারের মধ্যে এতোটা রাস্তা যেতে দিতে চক্রেশ হয়ত চাইবে না। আপনি ভোরবেলা উঠে আমাকে ডাকবেন। ঠিক আছে?"

রুদ্র ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল, "আচ্ছা ঠিক আছে। আমি আজকে রাস্তা ফ্ল্যাগ পুঁতে দিয়ে এসেছি। অসুবিধে হবে না কিছুই।"

রুদ্র চলে যেতে ঋতিকা আরেকবার ব্যাগটার গায়ে হাত বোলাল। সে বোধহয় একটু একটু বুঝতে পারছে তরলটা দিয়ে সে কি করবে।

।। পাঁচ।।

ঋতিকা আর রুদ্র পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে সূর্যের অপেক্ষায়। আকাশ ক্রমশঃ রক্তাভ বেগুনী থেকে চাল ধোয়া জলের মত রঙ নিচ্ছে। কিছুদূরে বিশাল কৈলাস পর্বত। এখানে বেশ কয়েকটা কালো কালো পাথর ছড়িয়ে আছে। সূর্য উঠল। প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ল কৈলাসের চূড়ায়। তারপরেই অবিশ্বাস্যভাবে আলো এসে পড়ল একটা পাথরের গায়ে। তারপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল উপত্যকার বরফের উপর। রুদ্র আর ঋতিকার মুখ ঝক ঝক করে উঠল। তাহলে তারা হিসাবে ভুল করেনি। দুজনে এসে দাঁড়াল পাথরটার সামনে। প্রায় দু মানুষ উঁচু কালো পাথর মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রায় পর থেকেই শুরু হয়েছে কৈলাসের একটি গিরিশিরা।

"আপনার ম্যাপ কি এই জায়গাটাকে নির্দেশ করছে?" ঋতিকা জিজ্ঞেস করল।

"না ঠিক এটা নয়। আসলে এর পরের পাথরটাকে নির্দেশ করছে। ম্যাপে বলে ছিল প্রথম থেকে তিনটে সমোচ্চ পাথর ছেড়ে। তিনটে সমোচ্চ মানে এই তিনটে। চতুর্থ হলো এর পরের পাথরটা।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এই পাথরগুলোকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

"আমি কালকে অনেক দেখেছি। কিছুই পাইনি। আমি ভাবলাম আজকে হয়তো সূর্য ওঠার সাথে সাথে কিছু একটা ঘটবে।"

"আরেকবার দেখা যাক পরীক্ষা করে। যদি কিছু পাওয়া যায়।" এই বলে ঋতিকা পরের পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল। রুদ্রর চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে শিশিটা বার করে তরলটা ছিটিয়ে দিল পাথরের উপর। অবিশ্বাস্য ভাবে পাথরের উপর একটা দরজার নকশা ফুটে উঠল। শিশিটা ব্যাগে ভরে ঋতিকা উত্তেজিত হয়ে ডাকল রুদ্রকে। দুজনে মিলে ভোরের আলোয় এক অকল্পনীয় দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

"তাহলে! তাহলে এটা সত্যি আছে? আমি ভুল নই।" উত্তেজনায় রুদ্রর গলা বসে গেছে, সে গোপন কথা বলার মত ফিসফিস করে বলল, "আমরা ভেতরে ঢুকবো না?"

ঋতিকা পাথরটা ছুঁয়ে দেখতে চাইল। মনে হচ্ছে পাথরের গায়ে কেউ সোনালী রঙ দিয়ে এঁকেছে এক অপূর্ব সুন্দর দরজা, কিন্তু সেখানে হাত ছোঁয়াতে পাথরের সোনালী গায়ে ঢেউ খেলে গেল। কোন অদৃশ্যশক্তিতে সোনালী দরজার মধ্যের পাথরের অংশটা উধাও হয়ে গেছে। ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঋতিকা আস্তে আস্তে হাতটা ঢুকিয়ে দিল সোনালী অংশের মধ্যে। হাতে সামান্য চিনচিনে ঠান্ডা ছাড়া আর কিছুর স্পর্শ পেল না সে। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল পাথরটা যেন ঋতিকার হাতটা খেয়ে ফেলেছে। বড় একটা শ্বাস ফেলে ঋতিকা সোনালী দরজায় মাথা গলাতে উদ্যত হল। রুদ্র ঋতিকার হাতটা চেপে ধরল। ঋতিকা অবাক হয়ে ফিরে তাকাল।

"এক সাথে।" রুদ্রও একটা বড় শ্বাস ফেলল। কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করে নিয়ে দুজনে একসাথে পা বাড়াল সোনালী দরজার অপর প্রান্তে।

ভেতরে একটা লম্বা সরু দরদালানে পা রাখল দুজনে। দরদালানটা অনেক দূর গিয়ে তারপর একটা বাঁক নিয়েছে। তার শেষে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। একটা নরম আলো কোথা থেকে দরদালানটায় ছড়িয়ে পড়ছে। ঋতিকা দালানের দেওয়ালে হাত রাখল। না প্লাস্টিক না ধাতু এক অদ্ভুত অনুভূতি তার হাতে ছড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালটা যথেষ্ট শক্ত এবং স্বচ্ছ। দেওয়ালের ওপাশে কালো পাথরের এবড়ো খেবড়ো গা দেখা যাচ্ছে। ঋতিকা দেওয়ালের গায়ে কোন জোড় খুঁজে পেল না। এমনকি স্বচ্ছ দেওয়ালের ওপাশে কোন আলোর ব্যবস্থাও দেখল না। দেওয়ালটা থেকেই যেন আলো বিকিরিত হচ্ছে।

রুদ্রের ডাকে ঋতিকার চমক ভাঙ্গল। "চলো। করিডোরের শেষে কি আছে দেখতে হবে। ঐ যন্ত্রটা কোথায় আছে খুঁজতে হবে।"

শুধু একটা নয়, বেশ কয়েকটা বাঁক ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষন হেঁটে ওরা এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। করিডোর এখানেই শেষ। কোন দরজা নেই। স্বচ্ছ দেওয়ালের অন্যপাশে পাহাড়ের কালো গা প্রতিভাত হচ্ছে। রুদ্র হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ দেওয়ালটাকে দেখল। কাছে গিয়ে হাত বোলাল দেওয়ালের গায়ে যদি কোন জোড়ের মুখ পাওয়া যায়। কিছুই পাওয়া গেল না। রুদ্র হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি ভুল করে ছেড়ে এলাম নাকি দরজাটা? আমি তো বামপাশটা ভালো করে নজর রেখেছিলাম। তুমি কি ঠিক করে দেখেছিলে?"

ঋতিকা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ দেখল দেওয়ালটাকে, "আচ্ছা করিডোর ধরে আমরা প্রায় কত দূর এসেছি এই করিডোর ধরে?"

ঋতিকার প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেল রুদ্র, আমতা আমতা করে বলল, "তা মানে ইয়ে প্রায় এক কিলোমিটার বা একটু কম হবে। "

"আমরা যে পাথরে ঢুকলাম সেখান থেকে কৈলাস পাহাড়টা কতদূর? "

"ওটা তো কৈলাসের একটা অংশ।"

"হুম। আপনার কি মনে হয়? আমাদের মাথার উপরে এখন কি আছে?"

"মাথার উপরে?" রুদ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একবার উপরের দেওয়ালটা দেখল তারপর মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

"উফ আপনাকে নিয়ে পারা যায় না।" ঋতিকা ভুরু কোঁচকালো, "আমাদের মাথার উপর এখন কৈলাস পর্বতটা আছে।"

রুদ্র একটা লাফ দিল, "বলেন কি?"

"হুম।" ঋতিকা গম্ভীর মুখে দরদালানের শেষপ্রান্তে এগিয়ে গেল, ব্যাগ থেকে শিশিটা বের করল। এখানে আর রুদ্রর থেকে লুকানোর কোন জায়গা নেই। সে দু ফোঁটা তরল স্বচ্ছ দেওয়ালের গায়ে ঢেলে দিল। পাথরের মত অনুরূপ ঘটনা ঘটল আবার। দেওয়ালের গায়ে একটা সোনালী দরজা ফুটে উঠল। ঋতিকা ঢুকে পড়ল দরজাটা দিয়ে।

দরজাটা ঋতিকাকে গিলে নিতেই রুদ্র হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল। দরজার ওপাশে পা বাড়িয়েই রুদ্র স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক প্রায় সুউচ্চ বিশালাকার ঘরের মধ্যে তারা দুজনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ছাদটা এতোটাই উঁচু যে ঠিকঠাক দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘরের মাঝখানে একটা বিশাল গোল স্তম্ভকার দেওয়াল উঠে গেছে প্রায় ছাদ পর্যন্ত। স্বচ্ছ সেই দেওয়ালের অপর প্রান্ত প্রচুর তার আর পাইপ সমৃদ্ধ একটা অদ্ভুত যন্ত্র দেখা যাচ্ছে।

রুদ্র আর ঋতিকা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল স্তম্ভটার কাছে। পুরো ঘরটার দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে ঐ স্তম্ভাকার অংশ। মাটির ভেতরেও স্তম্ভের অনেকখানি অংশ ঢুকে গেছে। স্তম্ভের চারপাশে প্রচুর মনিটর আর বিভিন্ন বোতাম আর অদ্ভুত নির্দেশাবলী সম্বলিত কন্ট্রোল প্যানেলে ভর্তি। ঋতিকা পায়ে পায়ে পুরো ঘরটাকে

ঘুরে দেখল একবার। অধিকাংশ মনিটর আর স্ক্রীন কাজ করছে। কন্ট্রোল প্যানেলগুলো পাঁচ ভাগে ভাগ করা। ঋতিকা স্ক্রীনগুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করতে চাইল কাজটা কি হচ্ছে। প্রথম প্যানেলের স্ক্রীনটা সে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারল। যন্ত্রটাতে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। তার বিভিন্ন রকম নির্দেশ। সেই অংশটা নিজে নিজেই কাজ করে যাচ্ছে। ঋতিকা ভালো করে দেখল আসলে দুটো যন্ত্র আছে। একটা যন্ত্র বন্ধ করা আছে। সেটা কোনরকম কাজ করছে না। আর অন্য যন্ত্রটাতে পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে। পাওয়ার গ্রিডটা যে ঠিক কি ঋতিকা তা বুঝতে পারল না। ঋতিকা আন্দাজ করল যে অন্য যন্ত্রটাই সেই ভূমিকম্প তৈরীর যন্ত্র যা মিরালেপা ব্যবহার করত। সেটা সম্ভবত সেই বারশো শতাব্দী থেকেই বন্ধ। সেই জন্যই একটা প্যানেলও সম্পূর্নভাবে বন্ধ। অন্য একটা প্যানেলে একটা বড় স্ক্রীনে ক্রমাগত লাল ডট ফুটে উঠছে বিভিন্ন সাইজের। ঋতিকা চোখ রাখল স্ক্রীনটাতে। স্ক্রীনটা বৃত্তাকার। তাতে তিব্বতকে কেন্দ্রবিন্দু করে ভারত, বাংলাদেশ, মায়নামার, চীন, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ অনেকখানি জায়গার ম্যাপ দেখা যাচ্ছে। যদিও ম্যাপটাতে দেশ হিসাবে কোন ভাগ নেই। অনেকটা প্রাকৃতিক মানচিত্রের মত। সেই ম্যাপটার বিভিন্ন জায়গায় বিন্দু বিন্দু লাল ডট ফুটে উঠছে। ঋতিকা বুঝতে পারল যে লাল ডটগুলো ছোট ছোট ভূমিকম্পের নির্দেশ। ভারতের পূর্ব দিকে একটা বড় লাল ডট দেখতে পেল ঋতিকা। এত বড় ডট! শিউরে উঠল ঋতিকা। কত মাত্রার ভূমিকম্পের নির্দেশ দিচ্ছে এটা? ভূমিকম্পটা কি এখনই হচ্ছে? ঋতিকা লক্ষ্য করল উত্তর হিমালয়ে একইসাথে আরেকটা ডট ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় হয়ে উঠছে।

"এই দেখুন কি পেয়েছি?" রুদ্র চেঁচিয়ে ডাকল ঋতিকাকে। রুদ্র একটা ডাইরী আর একটা বক্স নিয়ে এগিয়ে আসছে।

"কি ওটা?"

"ডাইরীটা কাঞ্চেন লামার। উনি এই প্যানেলগুলোর কাজকর্ম কিছু কিছু লিখে গেছেন। আর এই বাক্সটায় একটা ছোট বন্দুক মত আছে। আমার মনে হচ্ছে এটা স্ক্রু ড্রাইভার টাইপের কিছু। কারন বাক্সের উপর কাঞ্চেন লামা তাই লিখে রেখে গেছে।"

"দেখি ডাইরীটা?" শশব্যস্ত হয়ে ডাইরীটা কেড়ে নিল ঋতিকা। রুদ্র ভারী বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

পাতা উলটে দেখতে দেখতে সে একটা জায়াগায় ম্যাপের স্ক্রীনের ছবি দেখতে পেল। সেখানের লেখাটা প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে ফেলল ঋতিকা। একটা লাল ডট ফুটে ওঠার চব্বিশ ঘন্টা পরে সেখানে ভূমিকম্প হয়। যদি যন্ত্র চালু থাকে তাহলে ঐ লাল ডটটার আয়তন অনুসারে সেটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে বেগুনী রঙে পরিনত হয়। সব থেকে বেশী সময় লাগে বারো ঘন্টা। কিন্তু একসাথে যদি একাধিক বড়ো ভূমিকম্পের সূচনা হয়, তাহলে সবথেকে বড় ভূমিকম্পকেই প্রথমে হ্রাস করার চেষ্টা করে যন্ত্রটি। সেটি স্বাভাবিকের মধ্যে গেলে তবে সে দ্বিতীয় ভূমিকম্পকে হ্রাস করার চেষ্টা করে। যার ফলে আমাদের ভূখন্ডে কদাচিৎ বড়ো ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

পরের পাতা উলটে গেল ঋতিকা। বিভিন্ন সাইজের বৃত্ত এঁকে বিভিন্ন ভূমিকম্পের মাত্রা লিখে রেখেছেন কাঞ্চেন লামা। কিছুক্ষণ আগে যে দুটো বৃত্ত দেখে এল ঋতিকা তার মাত্রার পরিমান দেখে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। উত্তর হিমালয়েরটি দশ আর বাংলাদেশেরটি আট।

দশ! দশ মাত্রার ভূমিকম্প তো পৃথিবীতে ঘটেনি কখনো। তাহলে সেও কি এই যন্ত্রের জন্য? রুদ্র ঋতিকার এরকম অবস্থা দেখে কিছু বলতে সাহস পেল না। সে এখনো পর্যন্ত বিশেষ কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু ঋতিকাকে জিজ্ঞেস করতেও পারছে না। রুদ্র ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকল। ঋতিকা তাড়াতাড়ি করে পাতা উলটে খুঁজতে লাগল সার্কিটের কথাগুলো। খাতার প্রায় শেষের দিকে লিখে রেখেছে কাঞ্চেন লামা।

প্যানেলের এক বিশেষ বোতাম টিপলে খুলে যাবে স্তম্ভের দরজা। তারপরে বিশাল যন্ত্রটিকে ভাগ করে যথাসাধ্য দেখানো আছে কোথায় কোথায় সার্কিট বোর্ড নষ্ট হয়েছে। কোন সার্কিট বোর্ড কোথায় বসবে। কিভাবে যন্ত্রের উপর স্ক্রু ড্রাইভারটি ব্যবহার করতে হবে তাও সযত্নে লিখে রেখেছেন কাঞ্চেন লামা।

ঋতিকা রুদ্রকে সব খুলে বলতে রুদ্র একটু দোনামনা করল, "কে ঢুকবে ভেতরে?"

"আমি ঢুকব। কেন?"

কথা বলতে বলতে ঋতিকা প্যানেলের বোতাম টিপতে স্তম্ভের গায়ে একটা বিশাল দরজা খুলে গেল।

"ভেতরে যাবেন কি করে? এতো ফাঁকা।" – রুদ্র অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল। সত্যিই স্তম্ভের দেওয়াল থেকে প্রায় একমানুষ দূরে যন্ত্রের তার আর পাইপ। মধ্যের একমানুষ পরিধিতে কিছু নেই, বায়ু ছাড়া। কোন ব্রিজ নেই, দড়ি জাতীয় কিছু নেই। ঋতিকা তাহলে কাজ করবে কি করে? ঋতিকাও বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কি। ডাইরীটা উল্টেপাল্টে দেখল কোন উড়ক্কযন্ত্র গোছের কিছুর কথা আছে কিনা। প্রাচীন যোগী মিরালেপা নাকি উড়তে পারত। উনি না হয় উড়ে উড়ে কাজ করেছিলেন। কিন্তু কাঞ্চেন লামাও কি উড়তে পারত? ঋতিকা একরকম ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

"আর কষ্ট করতে হবে না রুবি। বাকিটা আমরা বুঝে নেব।" –প্রচন্ড চমকে উঠে দুজনে ফিরে তাকাল করিডোরের দরজার দিকে। দরজা গলে চক্রেশ ঢুকে এসেছে। তার হাতে ঝকঝক করছে একটা ধারালো আইস এক্স।

"এ কি তুমি? আইস এক্স নিয়ে কি করছো?" – ঋতিকা হতভম্বের মত বলে উঠল।

"তোমার কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখো ঋতিকা। আর এদিকে ঠেলে দাও।" – চক্রেশ আইস এক্সটা নাচাল।

রুদ্র ঋতিকাকে আড়াল করে দাঁড়াল, "তুমি একটা আইস এক্স দিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছো? ঐ জিনিসটা আমি স্কুল থেকে ব্যবহার করে আসছি।" হাত দশেক দূরেই রুদ্রর আইস এক্সটা পড়ে আছে। একবার ওটা হাতে পেয়ে গেল চক্রেশকে বুঝে নিতে রুদ্রর সময় লাগবে না।

রুদ্রর মতলব বুঝতে পেরেই বোধহয় চক্রেশ আরো খানিকটা এগিয়ে এল। "উঁহু চালাকি করে কোন লাভ হবে না।" রুদ্রর পিছনে ঋতিকা কোন কারনে একটু নড়ে উঠতে চক্রেশের মনঃসংযোগে ছেদ পড়ল। সময়টা নিপুনভাবে ব্যবহার করল রুদ্র। পলকের মধ্যে গড়িয়ে চলে গেল তার ব্যাগটার কাছে। নিমেষের মধ্যে তুলে নিল আইস এক্সটা। চক্রেশ সময়মত বুঝতে পেরে ছুটে এসে আইস এক্সটা দিয়ে একটা কোপ মারল রুদ্রর পিঠে। ঋতিকা আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু রুদ্র ঘুরে গিয়ে বসা অবস্থাতেই ঘুরে আইস এক্সটা ব্যবহার করে কোপটা আটকালো। একই সাথে লাথি চালালো চক্রেশের কোমর লক্ষ্য করে। বিদ্যুতগতিতে চক্রেশ একটু পিছিয়ে গেল। এখন রুদ্রের হাতেও একটা অস্ত্র চলে এসেছে। চক্রেশ একটু দূর থেকে গোল করে ঘুরছে অতি ধীরে। তার ঠাণ্ডা দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে মেপে নিচ্ছে রুদ্রকে। রুদ্র আইস এক্সটা হাতে নিয়ে নিবাত নিষ্কম্পের মত দাঁড়িয়ে রইল। একবার শুধু চোখের কোনা দিয়ে দেখে নিল ঋতিকার অবস্থান।

ঋতিকা ব্যাগটা নিয়ে সরে গেছে ঘরের আরেক কোনে। চক্রেশ খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল রুদ্রর দিকে। রুদ্র জানে তার রিফ্লেক্স ভালো। শেষ পর্যন্ত চক্রেশকে আসতে দিয়ে চট করে সরে গেল পাশের দিকে। একই সাথে আইস এক্সের হাতল দিয়ে খোঁচা মারল চক্রেশের পায়ে। চক্রেশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝের উপর। রুদ্র ঘুরে দাঁড়াল। চক্রেশ উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সমস্ত মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। সে রীতিমত শক্তিমান ছেলে। একসময় নিয়মিত বক্সিং করত। রুদ্রর মতন হিলহিলে একটা ছেলে কিনা তাকে ফেলে দিল। পায়ে ভালোই লেগেছে চক্রেশের। রুদ্রকে এইভাবে ঘায়েল করা যাবে না বুঝে চক্রেশ সময়

নিল। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সে শক্ত মুঠিতে ধরে রাখল আইস এক্সটা। পায়ের ব্যাথাটা ঠিক হয়ে গেলেই সে আবার চার্জ করবে। চক্রেশের অবস্থা বুঝতে পেরে রুদ্র এগিয়ে এসে দ্রুতগতিতে আঘাত করল। সে বারবার ডাইনে বাঁয়ে কুড়ল চালাবার মত আইস এক্স চালিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল চক্রেশকে। চক্রেশ এই ধরনের অ্যাটাকে অভ্যস্ত। সে দক্ষহাতে আটকাতে লাগল রুদ্রর প্রত্যেকটা মার। একই সাথে অন্য হাতে ঘুঁষি চালাতে লাগল রুদ্রর মুখ লক্ষ্য করে। চক্রেশের মত বক্সারের একটা ঘুঁষি খেলেই রুদ্র যে কুপোকাত হয়ে যাবে তা সে জানতই। কিন্তু রুদ্রর রিফ্লেক্স অনেক ভালো চক্রেশের থেকে। সে ডাইনে বাঁয়ে হেলে বা আচমকা বসে পড়ে চক্রেশের ঘুঁষিগুলোকে শূন্যে ভাসিয়ে দিল। চক্রেশ একটু বেসামাল হয়ে পড়ল। তখনই রুদ্র আইস এক্সের হাতল দিয়ে চক্রেশের মুখে সজোরে মারল। চক্রেশ টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। তার নাক দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছে দেখা গেল। রুদ্র অবাক চোখে দেখল এরকম মারে অন্য কারোর যেখানে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা সেখানে চক্রেশ দেওয়ালে একটু হেলান দিয়ে নিজেকে দিব্যি সামলে নিচ্ছে। এমনকি সে মুঠো থেকে আইস এক্সটাও ছাড়েনি। চক্রেশ নিজেকে পুরোপুরি সামলানোর আগেই রুদ্র আইস এক্স তুলল ওকে মারার জন্য। ঠিক তক্ষুনি একটা গম্ভীর গলার স্বর গমগম করে উঠল ঘরটায়, "স্টপ। ইফ ইউ নট। দেন আই উইল কিল হার।"

রুদ্রর আইস এক্স ধরা হাতদুটো শূন্যেই থেমে গেল। চোখের কোন দিয়ে সে দেখল আরেকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঢুকে এসেছেন ঘরের মধ্যে। তার হাতে ধরা একটা ছোট রিভলভার। সে বন্দুকটা তাক করে রেখেছে ঋতিকার দিকে।

রুদ্র আইস এক্সটা নামিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল। "ড্রপ ইট। ড্রপ ইট নাও।" প্রৌঢ় লোকটি রিভলভার নাচালো।

রুদ্র আইস এক্সটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিতেই চক্রেশ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। রুদ্র কোনমতে আটকানোর চেষ্টা করল চক্রেশের পাঞ্চগুলোকে। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যে একটা লাথি খেয়ে রুদ্র ছিটকে পড়ল মেঝের উপর। চোখে ঝাপসা দেখছিল রুদ্র। হাল্কা বমি বমি পাচ্ছিল। পেটের থেকে একটা অবশ করা ব্যাথা ক্রমশঃ উঠে আসছে খাদ্যনালী বেয়ে। চক্রেশ ওকে বিন্দুমাত্র সময় দিল না। এগিয়ে এসে উপর্যুপরি কয়েকটা ঘুঁষি মেরে প্রায় অজ্ঞান করে দিল রুদ্রকে।

রুদ্রর অবস্থা দেখে ঋতিকার হাত পা কাঁপছিল। এতদিনকার চেনা চক্রেশের এরকম নিষ্ঠুর অমানবিকরূপ দেখে ওর পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠেছিল। আর যে মানুষটা হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঋতিকার বিন্দুমাত্র বেচাল দেখলে যে গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা করবে না সেটা তার চোখ বলে দিচ্ছে। সেই মানুষটা ভারতের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তার স্যর। ঋতিকার মাথাটা কেমন ঘুরছে। হাত পায়ের উপর যেন কোন বশ নেই। ঋতিকা ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। পরক্ষনেই তার গলা চিরে একটা আর্তচিৎকার বেড়িয়ে এল। "না-আ!"

ঋতিকার চিৎকারে চক্রেশ ক্ষনিকের জন্য থামল, তারপরে এক হাতে নাকের রক্ত মুছে নিয়ে ঋতিকার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে হেসে বলল, "শত্রুর শেষ রাখতে নেই। এখানে মারলে বড্ড রক্ত গড়াবে। স্যর আবার রক্ত টক্ত বেশি পছন্দ করেন না।"

চক্রেশ রুদ্রর পা ধরে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল স্তম্ভের খোলা দরজার দিকে। রুদ্রকে দরজা টপকে ফেলে দেবে অতল গহ্বরে। রুদ্র ঠিক বুঝতে পারছিল না কি হচ্ছে। নাক মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বেড়িয়ে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। সারা শরীরে অসহ্য পিন ফোটানো ব্যাথা। একটা চোখ ফুলে গিয়ে বুজে গেছে। অন্য চোখেও ঝাপসা দেখছিল। চক্রেশ স্তম্ভের দরজার কাছে এসে ওকে তুলে দাঁড় করালো। রুদ্র

দুর্বল হাত দিয়ে দরজার কানাটা ধরে পতন রোধ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চক্রেশ সজোরে এক লাথি মারল রুদ্রর কোমরে। "যাহ্ আপদ দূর হ।" রুদ্রের শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে ছিটকে গেল শূন্যে।

ঋতিকার আর্তনাদের সাথে সাথে পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। কে যেন শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত করল রিভলভারধারীকে। ঋতিকার স্যর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। একটা লাল জামা পরা নেড়া মাথার ছেলে ছুটে এসে রিভলভারটা তুলে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়াল। ঋতিকা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পেমাকে। তারপরেই সে ছুটে গেল দরজার দিকে। সেখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চক্রেশ। স্বচ্ছ দেওয়ালভেদ করে ঋতিকা দেখতে পেল রুদ্রের শরীরটা শূন্যে ভাসছে। ঋতিকা ছুটে গিয়ে তুলে নিল চক্রেশের আইস এক্সটা। সজোরে বসিয়ে দিল চক্রেশের কাঁধে। একটা তীব্র চিৎকার কাঁপিয়ে দিল ঋতিকাকে। সে আইস এক্সটা ছেড়ে দিল। চক্রেশ কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিল তারপর চুপচাপ হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। শুধু একটা রক্তের পুকুর তৈরি হচ্ছিল তাকে ঘিরে।

ঋতিকা দুহাতে চোখ ঢেকে থর থর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল দেওয়ালের ধারে। সে মারতে চায়নি চক্রেশকে। মানুষটা খুনী। রুদ্রকে খুন করতে চেয়েছে। কিভাবে বাঁচবে সে একটা খুনীর হাত থেকে। তাই আইস এক্সটা দিয়ে... তার মাথা কাজ করছিল না।

"দিদি! দিদি!" ডাকে চটকা ভাঙ্গল ঋতিকার। পেমা তাকে ডাকছে। ছেলেটা এক হাতে রিভলভার ধরে ঠিক তাক করে রেখেছে প্রোফেসরের দিকে। ঋতিকা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল পেমার দিকে। পেমা ডাকল, "তুমি রিভলভারটা ধরতে পারবে? আমি তাহলে ওটাকে বেঁধে ফেলি।" ঋতিকা শিউরে উঠল। "না না।" "তাহলে ঐ দড়িটা দিয়ে তুমি বেঁধে ফেল।" ঋতিকা দেওয়ালে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। চক্রেশের নিঃস্পন্দ দেহটায় চোখ পড়তেই তার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে পড়তে লাগল। ঋতিকা আবার বসে পড়ল মেঝের উপর। "আমি পারছি না পেমা। আমি পারছি না।" ঋতিকা অসহায় কণ্ঠে বলে উঠল।

পেমা কঠিন চোখে তাকাল ঋতিকার দিকে। "ছিঃ। তুমি না একজন বিজ্ঞানী? তুমি না এখানে এসেছিলে এই যন্ত্রটা ঠিক করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাবে বলে? এখনো সেই কাজে তুমি হাত দিতেই পারোনি। আর তোমার নাকি হাত কাঁপছে দিদি?"

ঋতিকা কিছুক্ষণ ধরে নিজেকে সামলাল। একটু পরে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। "আমাকে রিভলভারটা দাও পেমা। তুমি বেঁধে ফেল। লোকটার গায়ে হাত দিতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।" পেমা ঋতিকাকে রিভলভারটা দিয়ে একটা পড়ে থাকা দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে ফেলল প্রোফেসরকে। প্রোফেসরকে বেঁধে ফেলার পর ঋতিকা অন্য একটা দড়ি নিয়ে একপ্রান্ত কোমরে বাঁধল আর অন্য প্রান্ত কন্ট্রোল প্যানেলের টেবিলে একটা হাতলের সাথে। দরজা দিয়ে ঝাঁপ খেল শূন্যের মধ্যে। ঋতিকা পালকের মত ভেসে রইল কিছুক্ষণ। এই জায়গাটায় কোন মাধ্যাকর্ষন কাজ করছে না। মাধ্যাকর্ষনবিহীন অঞ্চলে বাতাসে ভেসে থাকা যায় কিন্তু কোন বাইরে থেকে কোন শক্তি কাজ না করলে যে একটুও নড়া যায় না সেটা ঋতিকা টের পেল। বারবার শরীরকে সংকুচিত প্রসারিত করেও সে কিছুতেই রুদ্র জ্ঞানহীন ভাসমান শরীরটার কাছে পৌঁছতে পারল না। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সে আগেই দড়িটা বেঁধে নিয়েছিল। না হলে রুদ্রর মতো তাকেও অনাদিকাল ভেসে বেড়াতে হত ঐ শূন্যস্থানে। দড়িটা ধরে ধরে সে ফিরে এলো দেওয়ালের একদম গায়ের কাছে। তারপর পা দুটোকে বুকের কাছে জড়ো করে লাথি সজোরে লাথি মারল স্বচ্ছ দেওয়ালে। প্রতিক্রিয়া বলে ঋতিকার দেহটা শূন্যে ছিটকে উঠল। ঋতিকা হাত বাড়িয়ে অনায়াসেই ধরে ফেলল রুদ্রকে। তারপরে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে এসে মেঝেতে শোয়াল। পেমা ছুটে এল।

"তুই দেখ ওকে। আমি যন্ত্রটা সারাই।" ঋতিকা একবার আংশিক এশিয়ার স্ক্রীনটায় চোখ রাখল। লাল বৃত্ত দুটো এখনো দপদপ করছে। ব্যাগটা কাঁধ গলিয়ে নিয়ে নিল ঋতিকা। বাক্স খুলে স্ক্রু ড্রাইভারটা বের করে

নিল। কাঞ্চেন লামার ডাইরীটা হাতে নিয়ে ঋতিকা লাথি মারল দরজার কিনারায়। অনায়াসে যন্ত্রটার একটা শক্ত পাইপ ধরে ফেলল ঋতিকা। ডাইরী খুলে যন্ত্রাংশের ছবি দেখল। তারপর পাইপটা বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকল।

সমস্ত সার্কিট বোর্ডগুলোকে ঠিকঠাক লাগাতে ঋতিকার লাগল পাক্কা দু ঘন্টা। তার মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। পেটের সমস্ত জিনিস গলা বেয়ে উঠে আসতে চাইছে। এটা কি মাধ্যাকর্ষনহীনতার ফল? কোনরকমে দরজার কাছে পৌঁছে সে সবকিছু উগরে দিল মেঝেতে। ততক্ষণে রুদ্রের জ্ঞান ফিরেছে। পেমা আর রুদ্র দুজনেই ছুটে এল। ঋতিকার চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে রক্তখন্ড। রুদ্র আঁতকে উঠল। ঋতিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "যন্ত্রটা চালু কর। এক্ষুনি।"

কাঞ্চেন লামার ডাইরীতে লেখা নির্দেশাবলী মেনে রুদ্র প্যানেলের বোতামগুলো টিপে প্রথমে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর একটা বোতাম টিপে সাকশন সিস্টেম চালু করল। বদ্ধ স্তম্ভের ভেতরের সমস্ত বাড়তি জিনিস সে শুষে ফেলে দিল বাইরে। এবার শেষ বোতামটা টিপল রুদ্র।

নিস্তব্ধতা ছেয়ে আছে ঘরটাতে। সবাই শ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল কিন্তু যন্ত্রটা চালু হল না। "তুমি ঠিকঠাক সার্কিটগুলো লাগিয়েছিলে তো?" রুদ্রর কথা শেষ হতে না হতেই একটা তীক্ষ্ণ শিষের শব্দ শোনা গেল। তিন জনে অবাক হয়ে তাকাল যন্ত্রটার দিকে। একটা করে আলো জ্বলে উঠছে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে। রুদ্র একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে ঋতিকার পাশে এসে বসল। যন্ত্রটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে ক্রমশ গতি নিচ্ছে বোঝা গেল। ঋতিকার খুব ক্লান্ত লাগছিল। শক্ত দেওয়ালে মাথা না রাখতে পেরে সে ঘাড়টা কাত করে রুদ্রর কাঁধে রাখল। রুদ্র একবার আড়চোখে দেখল। কিছু বলল না। পেমা এসে গুটিসুটি মেরে রুদ্রর অন্য পাশে বসল। রুদ্র হাসিমুখে পেমার মাথায় একটা ছোট্ট গাঁট্টা মারল।

কিছুক্ষণ পরে রুদ্র জিজ্ঞেস করল, "এবার আমরা কি করব?" ঋতিকা মাথা তুলল, "অপেক্ষা।"

রুদ্র অবাক গলায় বলল, "কিসের?"

"ঐ যে স্ক্রীনে লাল ডট দুটো আছে। সেই দুটো সাইজে কমে আসবে আর বেগুনী রঙ নেবে।"

"কতক্ষন সময় লাগবে?" পেমা ঘাড় বাড়াল।

"বারো ঘন্টা লাগার কথা। কিন্তু আমি জানি না বাংলাদেশের উপরে যে লাল ডটটা আছে সেটা কতক্ষন আগের। ঐ অঞ্চলে যদি আট মাত্রার ভূমিকম্প হয় তাহলে আমাদের কলকাতাও বাদ যাবে না। কত কোটি মানুষের সর্বনাশ ঘটবে ভাবতে পারছো?" ঋতিকা শিউরে উঠল।

"তাহলে যন্ত্রটা ঐ ভূমিকম্পটার মাত্রা আগে কমাচ্ছে না কেন?" রুদ্র অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করল।

"কারন উত্তর হিমালয়ে কাশ্মীরের ভূমিকম্পটা দশ মাত্রার। ওটা হলে সম্পূর্ন কাশ্মীরটাই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। আগে ওটাকেই কমানো উচিত।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঋতিকা।

অনেকক্ষন কেটে গেছে। পেমা ফিরে গেছে তাদের ক্যাম্পে। রুদ্রদের জন্য কিছু শুকনো খাবার নিয়ে ফিরে আসবে সে।

রুদ্ররা বেড়িয়ে আসার কিছুক্ষন বাদেই চক্রেশরা আক্রমন করেছিল রুদ্রদের তাঁবুতে। ওরা তিনজন ছিল। শিন লিং আর পেমাকে আটকে রেখে মালবাহকদের ওরা ছেড়ে দিয়েছিল। পরে চক্রেশ আর ঐ প্রোফেসর রুদ্রদের পিছু ধাওয়া করতে তাঁবুতে মাত্র একটা শেরপা ছিল ওদের পাহারা দেয়ার জন্য। শিন লিং সেই শেরপাটার সাথে মারপিট করেই আহত হয়। শেরপাটাও অবশ্য মারাত্মক আহত হয়েছে। শিন লিংকে তাঁবুতে রেখে পেমা তাই একাই এসেছিল একই পথ ধরে। শিন লিং তাঁবুতে অপেক্ষা করছিল রুদ্রদের জন্য। তার পায়ে ভালোই চোট লেগেছে। পেমাকে আসতে দেখা সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

।। ছয়।।

রুদ্র ঋতিকার কথা মতো বিভিন্ন প্যানেলের ছবি তুলছিল। ঋতিকা বন্ধ প্যানেলগুলো থেকে বোঝার চেষ্টা করছিল যে কোন বোতামগুলো এই গুপ্তদ্বারের দরজা সম্পূর্নভাবে বন্ধ করতে পারবে। ঘরের এক কোনায় একটা টেবিল আর ছোট প্লাস্টিকের আলমারি ভর্তি কাগজপত্র ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে ঐ টেবিল, আলমারীগুলো অপার্থিব কিছু নয়। অনেক বছর ধরে কাঞ্চেন লামা যে কাজ করছিল ঐ যন্ত্রটার উপরে তারই ফলশ্রুতি ঐ কাগজগুলো। ঋতিকা সেগুলো পড়ে পড়ে দেখছিল। যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়।

পেমা ফিরে এল খাবার নিয়ে। একটু খেয়ে নিয়ে সবাই এবার ঝুঁকে পড়ল কাগজগুলোর উপর।

খানিকক্ষণ পড়ে ঋতিকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। "বুঝতে পেরেছি কেন কেউ এই দরজা বন্ধ করতে পারেনি।"

রুদ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

"এই গুপ্ত দরজা বন্ধ করতে গেলে সেটা বাইরে থেকে করা সম্ভব নয়। এই ভেতরে থেকেই তা করতে হবে।"

"তাতে কি হয়েছে?" –রুদ্র বুঝতে পারল না ঋতিকার কথা।

"তার মানে এই দরজা যে বন্ধ করবে তাকে চিরদিন আটকে থাকতে হবে এই ঘরের মধ্যে।"

রুদ্রর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। "এর কোন বিকল্প নেই?"

ঋতিকা ঘাড় নাড়ল।

পেমা এতক্ষন মুখ বুজে দুজনের কথা শুনছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু মিরালেপা কেন তা করে যাননি? তার তো কোন পিছুটান ছিল না। তিনি তো মহাজ্ঞানী, মহাযোগী ছিলেন।"

ঋতিকা চেয়ারটায় বসল, "মিরালেপা একজন খুব উঁচু মানের বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ভেবে রেখেছিলেন যে তাঁর জীবিত অবস্থাতেই তিনি এই গুপ্তদ্বার বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি কারন এই দ্বার বন্ধ করার যে তরল। তা অত্যন্ত বিষাক্ত। সেই তরলটি তৈরি করতে গিয়েই উনি মারা যান।"

রুদ্র ঝুঁকে বসল। "সেই তরলটা কোথায়? তোমার কাছে যেটা আছে সেটা?"

ঋতিকা আলমারী খুলে একটা শিশি বার করল, "না। সেটা কাঞ্চেন লামা এখানে রেখে গেছেন।"

পেমা এগিয়ে এল। "আমি থেকে যাব এখানে। আমি বন্ধ করে দেব এই গুপ্তদ্বার।"

স্বাভাবিক ভাবেই রুদ্র আর ঋতিকা আমল দিল না পেমাকে।

রুদ্র বলল, "ঠিক আছে সে দেখা যাবেখন। এখন চল খেয়ে নেওয়া যাক।"

ঋতিকা একবার স্ক্রীনটা দেখল, কাশ্মীরের লাল বৃত্তটা ছোট হয়ে এসেছে প্রায় বাংলাদেশের বৃত্তের সমান। স্ক্রীনে দেখাচ্ছে যন্ত্র এবার বাংলাদেশের ভূমিকম্পের উপর কাজ করছে। ঋতিকার মনটা খুশি হয়ে উঠল। অন্ততঃ কিছুটা কমলেও মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

পেমা খাবারের প্যাকেট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের বন্দীকে কিছু খেতে দেওয়া হবে না?"

রুদ্র প্রোফেসরের খানিকটা দূরে প্রোফেসরের দিকে ফিরতেই চমকে উঠল। প্রোফেসর কখন বাঁধন খুলে ফেলেছেন। তার হাতে চক্রেশের সেই তীর ছোঁড়া বন্দুকটা। প্রোফেসর হিস হিসিয়ে উঠল, "এতই সহজে তোমরা সব কিছু করে ফেলবে ভাবছো?" রুদ্র শান্তভাবে প্রোফেসরের দিকে তাকাল, "এখানে আমরা তিনজন প্রোফেসর। আর আপনার বন্দুকে তীর একটাই। কাকে মারবেন?"

প্রোফেসর নিষ্ঠুরভাবে তাকাল রুদ্রর দিকে, "তোমাকে। বাকি দুটোকে ঘায়েল করতে আমার খালি হাতই যথেষ্ট।" প্রোফেসর ট্রিগার টানতেই রুদ্রকে কে যেন একটা প্রচন্ড ধাক্কায় সরিয়ে দিল। মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও রুদ্র সামলে নিল নিজেকে। অবাক চোখে দেখল পেমার বুকে তীরটা আমূল বিঁধে গেছে। ততক্ষণে ঋতিকা তাড়া করেছে প্রোফেসরকে। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রোফেসরও দরজা গলে করিডোরে ঝাঁপ দিল। রুদ্র হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে ছুটে এল পেমার কাছে।

পেমা তীরটা টেনে বের করতে করতে বলল, - "আমার কিছু হয়নি। লোকটার হাতে এখনো অস্ত্র আছে। তুমি লোকটাকে ধর।"

রুদ্র মেঝে থেকে একটা আইস এক্স কুড়িয়ে নিল। ঋতিকা খালি হাতে পিছু নিয়েছে প্রোফেসরের। রুদ্র করিডোরে বেরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা করিডোরটা রুদ্র যেন চোখের পলক ফেলার আগেই পেরিয়ে গেল। বাইরে বরফের উপর বেশ অনেকটা দূরে ঋতিকাকে দেখা যাচ্ছে। তারও পরে আরো দূরে প্রোফেসর। দুজনেরই দৌড়ানোর গতি কমে গেছে পিছল বরফের উপর। রুদ্র দ্রুত ঋতিকার কাছে পৌঁছে তাকে থামাল। ঋতিকা যেভাবে দৌড়চ্ছিল তাতে যেকোন সময়ে পিছলে পড়ে মারাত্মক আহত হতে পারত। ঋতিকাকে পেমার কাছে ফিরতে বলে। রুদ্র দক্ষ পর্বতারোহীর মত পা টিপে টিপে পিছল বরফের উপর দিয়ে চলতে লাগল। সে একবারো দৌড়ানোর চেষ্টাও করল না। অনেকটা দূরে প্রোফেসর যে একবার সজোরে আছাড় খেল বরফের উপর তা সে পরিষ্কার দেখতে পেল। রুদ্র কাছাকাছি পৌঁছাতেই প্রোফেসর ঘুরে দাঁড়াল। তিনি কখন আরেকটা তীর লাগিয়ে নিয়েছেন তার ক্রশবোতে। প্রোফেসরের এবারের তীরটা রুদ্র আইস এক্স দিয়ে সহজেই আটকে দিল। রুদ্রর দিকে আতঙ্কিতভাবে চেয়ে প্রোফেসর তার জামাকাপড় হাতড়াতে লাগল আরেকটা তীরের সন্ধানে। তীর না পেয়ে প্রোফেসর উদভ্রান্তের মত দৌড়তে শুরু করল পাহাড়ী ঢাল বেয়ে। রুদ্র পিছন থেকে চেঁচিয়ে সাবধান করার চেষ্টা করল প্রোফেসরকে। তার আগেই প্রোফেসর গতিজাড্য সামলাতে না পেরে তীব্র গতিতে গিয়ে আঘাত খেলেন একটা বড় পাথরে। তারপর সেই পাথরের সাথে দলা পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গড়িয়ে পড়লেন নিচের শক্ত বরফে। রুদ্র আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল ঢালটার গায়ে। বেশ খানিকটা নিচে নীলাভ শক্ত বরফের উপর প্রোফেসরের হাত পা ছড়ানো থেঁতলে যাওয়া দেহটা দেখে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। তখনো প্রোফেসরের অন্তিম চিৎকারের রেশ মিলিয়ে যায়নি বাতাস থেকে।

রুদ্র ফেরার সময় লক্ষ্য করল কৈলাসের চূড়ায় মেঘ জমেছে। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে কিন্তু গতকালের মত সোনা রঙ দেখা যাচ্ছে না কৈলাসের চূড়ায়। কালো পাথরের গায়ে আঁকা সোনালী দরজার কাছে এসে সে হতভম্ব হয়ে গেল। কালো পাথরটা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে আঁকা নেই কোন দরজা। পাথরটার সামনে ঋতিকা বসে আছে মুখ নিচু করে। চারিদিকে ছড়ানো প্লাস্টিকের বাক্স আর ব্যাগ। রুদ্র গিয়ে হাত বোলাল পাথরের গায়ে। নাহ কোন তরঙ্গ ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ল না।

"ও ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে দরজাটা।" ঋতিকা কান্না ভেজা কথাগুলো রুদ্রকে বাকরুদ্ধ করে দিল।

"না" বলে ক্ষোভে দুঃখে রুদ্র একটা ঘুঁষি মারল পাথরের গায়ে। ঋতিকা তাড়াতাড়ি এসে জড়িয়ে ধরল রুদ্রকে। রুদ্রের হাত কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। কিন্তু তার থেকেও বেশি অন্য কোথাও আহত হয়েছিল রুদ্র। কিছুতেই থামাতে পারছিল না নিজেকে। চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়ছিল।

কতক্ষন দুজনে চুপ করে পাথরটার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল মনে নেই। ঝুরো ঝুরো বরফ জমে উঠছিল কাঁধ মাথা ঘিরে।

একসময় দূরে বরফের মধ্যে দেখা গেল একটা মূর্তি তার পিছনে আরো কয়েকজন। শিন লিং থাকতে না পেরে আরো দু জন মালবাহককে ধরে এনেছে দ্রিরাপুক গুম্ফা থেকে। ঋতিকা আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

তিনটে বড় বড় প্লাস্টিক বাক্স ভর্তি কাগজ। ঋতিকা যত্ন করে গুছিয়ে রাখছিল সেগুলো ক্যাম্পে বসে। পেমা শেষ মুহূর্তেও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়নি। কাঞ্চেন লামার লিখে যাওয়া এই কাগজগুলো যে বিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ তা সে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। এইগুলো দিয়েই হয়ত ঋতিকা আরো অনেক ভূমিকম্প নিরোধক যন্ত্র তৈরি করতে পারবে একদিন। কাগজগুলো গুছিয়ে ঋতিকা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। অন্যান্য তাঁবুগুলো গুছিয়ে ফেলেছে শিন লিংরা। ঋতিকা বেরিয়ে আসতে তারা ঐ তাঁবুটাতে হাত দিল।

অদূরে একটা বড় পাথরের উপর রুদ্র বসে আছে। আনমনা চোখ কৈলাসের চূড়ায়। এই অভিযান তার জীবন থেকে অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়েছে তার মা বাবা, মানুষের লোভের শিকার হয়েছে তার প্রিয় বন্ধু গোপালাচারী আর অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক কাঞ্চেন লামা। আর মানবকল্যানের জন্য শেষকালে এই অভিশপ্ত যন্ত্র ছিনিয়ে নিল পেমাকেও।

ঋতিকা এগিয়ে এসে রুদ্রর হাতে হাত রাখল। রুদ্র শক্ত হাতে ধরে রাখল ঋতিকার হাতটাকে।

লেখক পরিচিতি

অঙ্কু আপাতত মুড়োঝ্যাঁটা দিয়ে ঘর পরিষ্কারে ব্যস্ত। লেখক পরিচিতি তাই পাওয়া যায় নি।